একটি অশ্রু দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ

নীলকণ্ঠ

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

অভিন্নহৃদয়েষু

নীলকণ্ঠ বিরচিত

॥ অন্যান্য বই ॥

চিত্র ও বিচিত্র

তারা তিনজন

বসন্ত কেবিন

ননী গোপালের বিয়ে

জীবনরঙ্গ

হরেকরকমবা

অদ্য ও প্রত্যহ

অপাঠ্য

নব বৃন্দাবন

সবিনয় নিবেদন,—

এই আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ; সম্ভবত শেষও। সাহিত্যে ছোট গল্পের এবং গীতিকবিতার দিন গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। ওর দুজন ফর্ম হিসেবে ওবসোলিট হয়ে গেছে বহুকাল। এই গ্রন্থের দুটি গল্প এর আগে অনেক বাড়িয়ে আমি উপন্যাসে ব্যবহার করেছি আমার বাধ্য হয়ে। এখানে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপটিই সাহিত্যগ্রাহ্য,—এই কারণে এখানেই তার যথার্থ এবং সানন্দ উপস্থিতি অনিবার্য্য কারণে।

—॥ নীলকণ্ঠ ॥

॥ একটি অশ্রু ॥

সুরঞ্জনা

কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "সুরঞ্জনা না?" হ্যাঁ, আর বলে দিতে হবে না, অবিকল সেই.চেহারা। সেই কালো পুরু ঠোঁটের ওপর আরো কালো ছোট্ট তিল...

মন্টি কার্লোয় ডিরেক্টর সুব্রত দাশগুপ্তকে ওরা ধরে বসেছিল তার নোতুন হিরোইন সুরঞ্জনাকে সে কি দেখে তার নোতুন এই বাইশ লাখী ছবি "ঘোমটার আড়ালে'র" প্রধান নায়িকা করলে। জিজ্ঞেস করবার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। সুব্রত দাশগুপ্ত যখনই যে-বই সুরু করেছে তখনই তার ছবির হিরোইন হয়েছে কোনও নতুন মুখ। আর সেই নতুন মুখ তার হাতে পড়ে প্রত্যেকবারই পুরনো মুখশ্রীদের ম্লান করে দিয়েছে। সুব্রত দাশগুপ্তর সব ছবিই কিছু রজত-জয়ন্তী-সপ্তাহের সম্মান পায় নি, কিন্তু তার হাতের সব কটি হিরোইনই রাতারাতি স্টার হয়ে গেছে একের পর এক। সুব্রত দাশগুপ্তের তারারা সবাই ছিল মেঘের আড়ালে মেঘ সরিয়ে সুব্রত তাদের মাটির মানুষের গোচরে এনেছে একদিন হঠাৎ আর তারা অবাক হয়ে গেছে জল্পনা কল্পনা সুরু করে দিয়েছে নোতুন তারা কোথায় ছিলো। সুব্রত কিছু বলে নি। হেসেছে। মনে মনে শুধু নিশ্চিন্ত হয়েছে এবারেও ভুল হয় নি তার, এ-তারা তারাই। কিন্তু এবারে হেসে উড়িয়ে দিলে আর শুনছে না। ওরা আজকে জানবেই স্টার হওয়ার অভিধানে যে যে বিস্তৃত পরিচয়গুলো মেপে জুকে দেগে দেওয়া আছে তার কোনটির সঙ্গে সুরঞ্জনার মিল আছে! একটাও নয়। কোনটাই নয়। সুরঞ্জনার মুখ যাই হোক তাতে সস্তা কিম্বা বিদুষী কোনরই আদল পুরো নেই। সুরঞ্জনা ক্যামেরা ফেস থেকে অনেক দূরে। সুরঞ্জনা অত্যন্ত রোগা। মাত্র দুটি মেয়ের মধ্যে দেখলেও

তাকে মনে রাখা শক্ত। গলার স্বরও সুব্রত স্বীকার করেছে নিতান্ত আটপৌরে। সে গলায় ঝর্ণা ধ্বনি দূরে থাক, কোরাস গানেও সুরঞ্জনার গলা সম্পূর্ণ অচল। তার শরীরে মার্জার গতি নেই, তার মুভমেন্ট শ্লো-মোসান পিকচারের। শুধু বুকের কাছে এসে আপনার আমার তোমার সকলের চোখই থামবে একবার। অনেকখানি কাটা জামার ফাঁক থেকে অনেকখানিই দেখা যায় যার সঙ্গে এক তুলনা চলত যদি মোটর গাড়ীতে হর্ণ থাকত একটা নয় ছুটো। কিন্তু শুধু তার ওপর নির্ভর করে একজনকে বড়জোর ত্নসীনের দেখবার আগেই ফেড আউট করা কোনও চরিত্রে পরিচালকের ব্যক্তিগত চরিত্রের তুর্বলতার মাশুল জোগানর জন্যেই নামান যেত মাত্র। কিন্তু নায়িকার পার্টে সুরঞ্জনা অকল্পনীয় এমন কি বাংলা ছবিতেও।

সেই সুরঞ্জনাকে সুব্রত সমস্ত সহরে, নর্থ কোরিয়ার প্রথম অগ্রগতির হট্টগোলকেও হারমানানো হৈ চৈ তার নোতুন ছবি "ঘোমটার আড়ালে-র নায়িকা নির্বাচন করলে আর বল্লে এ তার নোতুন আবিষ্কার নয়, এ-তার শেষ আবিষ্কার। তার হাতের বাকী সব কটি ছবিতেই সুরঞ্জনা নামবে একদিকে, নোতুন নোতুন চরিত্রে এক্সপেরিমেণ্ট করবে তাকে দিয়ে সুব্রত। তার প্রথম ছবির প্রথম চরিত্র যাকে সুরঞ্জনা জ্যান্ত করে তুলবে সে হোল একটি মায়ের ভূমিকা। চল্লিশের প্রায় প্রান্তে এসে যে মা তার ষোল বছরের মেয়ের গানের মাষ্টারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একদিন। সমাজের নিষেধ বংশের মর্যাদা কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারল না। শুধু নিয়ে গেল চল্লিশ টাকার গানের মাষ্টার পাখীকে যেমন করে নিয়ে যায় সাপ। এই দূরূহ আর অস্বাভাবিক চরিত্রকে যে-মেয়ে সুব্রতর মতে অত্যন্ত স্বাভাবিক করে তুলবে, যে মেয়েকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পায় নি তাকে আবিষ্কার করলে সে কেমন করে তারই কথা আজ মন্টি কার্লোর বাইরে বৃষ্টির জলে আর ভেতরে রঙ্গীন সলিলে জমে উঠল ঘড়িতে যখন রাত আটটা আর রাস্তায় যখন জল জমেছে আধপুকুর আর রেস্তোরার কামরায় যখন আমরা ছাড়া আর মাত্র একটি মোটা ফিরিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে

প্রেমগুঞ্জনে মত্ত তুটি বাঙালী ছোকরা—অবিবাহিত চাকরে কোন সওদাগর অফিসে।

আমরা যেদিনের কথা বলছি তার আগের দিন হাওয়া অফিস খবর দিয়েছিলো অলইণ্ডিয়া রেডিওর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে আগামীকাল ঝড় উঠবে সন্ধ্যে সাতটার সময়। কিন্তু ঝড় উঠলো বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তুপুরে যা ছিলো ছুটকো মেঘ ড্যালহাউসী স্কোয়ারে কেরাণীর পাল অফিসের দরজা থেকে যখন নিজের নিজের ছাতায় মাতা গলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো একে একে তখন রাগে থম থম করছে সারা আকাশ। মেঘের পঙ্গপালে অন্ধকার হয়ে এলো জব চার্ণকের কলকাতা। ধুলো উড়লো গড়ের মাঠ থেকে ফুটপাথে। রাস্তার হকার বেসামাল হাতে জিনিষপত্তর বাঁধতে আরম্ভ করলে ব্যর্থ ব্যবসার হতাশ ধিক্কারে, আর সকালে বাজার কি হবে'র বিপুল তুশ্চিন্তায়। আলগা শিক ছাতা উল্টে পড়তে লাগল আর উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল মাথা গুঁজে দেওয়া মালিককে। ফিরিঙ্গি লেডি টাইপিস্টের তু হাতে চেপে ধরে থাকা স্কার্ট বাধা মানলে না। হাঁটুর ওপর থেকে উঠে গেল কোমরের ওপর। ট্রামে আর পথে ধুলোয় তু চোখ ভরে গেলো ড্রাইভারের।

তারপরে নামলো বৃষ্টি। গঙ্গার একটা ছোট অংশ উঠে এলো ঠনঠনে আর চীৎপুরে। আর নীচু দালান বাড়ীর উঠানে কাগজের নৌক ভাসালে খেলতে বেরুনো বন্ধ দেশের ভবিষ্যতেরা আটটা রাতের গরম খিচুড়ির জিভে জল আসা প্রত্যাশায়। বাড়ীর চাল ফুটো হয়ে আঝোর কান্না নামল আকাশ থেকে মাটিতে। ট্রাম দাঁড়িয়ে রইল চলে যাওয়া বাসের দিকে করুণ চোখে চেয়ে। শুধু এখানে ওখানে সেখানে বকের মত দাঁড়িয়ে রইল ক্যালকাটা পুলিশ। হায় হায় করতে করতে ছাদে দৌড়ে এলো মাসিক বসুমতী পড়তে পড়তে বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়া গিন্নীর দল। রান্নার জন্যে গুল দেওয়া ছিল, তারা সারা ছাদ জুড়ে ছড়িয়ে আছে কাদা হয়ে। আর বিকেল বেলাতেই রাত হয়ে আসা বালীগঞ্জের বাতায়ণ থেকে কাকে দেখে কে গাইলে, মন মোর মেঘের সঙ্গী......

মন্টিকার্লোয় আমরা সেদিন বাইরে জলের সঙ্গে ছন্দ বজায় রাখবার জন্যেই ভেতরেও ভেসে পড়েছিলাম রঙ্গীন সমুদ্রে। এক ডিরেক্টর সুব্রত ছাড়া। সে ফিল্ম লাইনে ঢুকেও মদ খায় না—শরৎবাবুর বেশ্যারা যেমন কখনও স্বর্গীয় প্রেম ছাড়া আর কিছুর জন্যে উদ্বেল হয় না তেমন। সুব্রত বল্লে!' আজ তোমরা আমায় এত অবিশ্বাস আর ঠাট্টা করেছ যে এর পর যে পরিস্থিতিতে আমি সুরঞ্জনাকে নায়িকা করলাম তা সোজা কাঁচা ভাষায় বর্ণনা করে গেলে, অর্থাৎ সর্বাধুনিক বাঙালী লেখকদের ভাষায় তোমরা তাকে বলবে গল্প, আমিও বলব গল্প এবং বলব গল্পের চেয়েও বেশি।

ওল্ড থিয়েটারকে তোমরা পুরণো কেল্লার সঙ্গে তুলনা করে থাক। আমিও ওকে পুরোণো কেল্লাই বলি, কারণ ওখানে প্রয়োজনের বাইরে একজন লোকেরও ঢোকা ফোর্টে ঢোকার মতই ঘাম বার করে দেওয়া ব্যাপার। আমার সঙ্গে দেখা করা বোধকরি ব্যাকিংহ্যাম পালেসে রাজার সঙ্গে দেখা করার চেয়েও সে সময়ে শক্ত। আমি তখন আমার নোতুন বইএর হিরোইন খুঁজছি। শয়ের পর শ ছবি দেখে চলছি। ইণ্টারভিউ দিচ্ছি আর সবাইকে বলছি পরে খবর দেব! আর চাকরীতে পরে খবর দেব বলার মানে ত তোমরা সবাই জান। এই সময়ে আমার একদিন অফিস যেতে একটু দেরী হয়েছিল। গিয়ে তেতলায় আমার ঘরে দেখি একটি মেয়ে বসে আছে আগে থেকেই। অত্যন্ত বিরক্ত হলাম, আমার ঠোঁটকাটা বদনাম বন্ধু বান্ধবদের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকদূর গেছে বলেই আমার ধারণা :ছিলো। সেই সীমানার বাইরে থেকে যে এসে বসেছিল সে মেয়ে হলেও ক্ষমার যোগ্য নয়। কড়াভাবেই জিজ্ঞেস করলাম; আমার সঙ্গে কি আপনার এপয়ন্মেণ্ট ছিলো? মেয়েটি বল্লে; না আপনার সঙ্গে যাদের এপয়ন্মেণ্ট হতে পারে আমি তার চেয়েও অনেক নীচের তলায় থাকি। যাদের সঙ্গে আপনার এপয়ন্মেণ্টের বাইরে দেখা করতেও বাধে না, বুঝতেই পারছেন আমি তাদের দলেরই নই। এপয়ন্মেণ্টের অপেক্ষায় থাকলে যাদের সঙ্গে আপনার

কখনোই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই আমি তাদেরই স্বগোত্র। আমার নাম সুরঞ্জনা।

কড়া সুর গলায় বজায় রেখেই বলতে হোল; কিন্তু আমি,—আমি যে—

'ব্যস্ত'। জানি মেয়েটি নিজেই জুড়ে দিল; কিন্তু আপনার চেয়ে আমি অনেক ব্যস্ত। শুধু তাই নয় আপনি ব্যস্ত বলে আপনার সাক্ষাতকারীদের ফিরিয়ে দেবার জন্যেও অন্তত একটি লোক গেটে আছে এবং আরেকটি আপনার দরজার গোড়ায় সব সময় আপনার চেয়েও ব্যস্ত হয়ে আছে। আমার মা আর ভাইয়ের ভাত জোগাবার জন্যে আমি এত ব্যস্ত যে আমার একদিন অসুখ করবারও সময় নেই।

'প্রয়োজন?' পেয়ে বসবার আগে আমি আরোও কড়া হলুম।

অনেক, তবে আপনার কাছে এসেছি সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনে। ঘোমটার আড়ালে আপনি নায়িকার ভূমিকায় এখনো কাউকে নেন নি—এখনও আপনি মেয়ে খুঁজছেন।

'হ্যাঁ'।

আর খোঁজবার প্রয়োজন নেই। সে এসে গেছে।

'কি রকম' ব্যঙ্গ করবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলাম না।

"ঠিক যেরকমটি আপনি খুজছিলেন।"--আশ্চর্য মেয়েটি এবারেও অপ্রতিভ হলো না একটুও বরং আমাকে একটু অপ্রতিভ করে দিলে। ব্যঙ্গ করলে যে সরল ভাবে কথাটাকে নেওয়ার ভাণ করে, তখন আমিও যে সরল ভাবেই কথাটা বলেছিলাম এ-ভান না করলে আর চলে না। তাই এবারে আমি সোজাসুজি বলে বসলাম, আপনি পাগল নন তা আপনার সাজিয়ে কথা বলবার কায়দাতেই বোঝা গেছে। কিন্তু আপনার আশার বহরটা প্রায় পাগলামির সীমাতে গিয়ে পড়ছে না!

পড়ছে। তবে পাগলামি জিনিষটা এমনি পয়সাকড়ির ব্যাপারে বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে যে যত পাগল সে ততই বাঞ্ছনীয়। অভিনয়-পাগল না হলে সত্যিকারের অভিনয় কাউকে দিয়ে হয় সুব্রতবাবু?

এ-মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। ঘণ্টা বাজিয়ে এসিসটেণ্টকে

ডাকলাম। ঘোমটার আড়ালে নামবার জন্যে যারা ছবি পাঠিয়েছে সেই ছবির ফাইলটা নিয়ে এসো একবার।

"এ-তে মাত্র কয়েকটি ছবি আছে, ছবিগুলো আপনি একবার দেখুন এবং ওই মেয়েগুলির আগের আগের অভিনয়ের অভিজ্ঞতার সবিস্তার লিখিত বর্ণনাও আপনাকে দেখাব। তারপর—

তারপরও আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব। যদি চেহারার প্রশ্ন তোলেন ত বলব সিনেমায় সুন্দরী মেয়ের চেয়ে টাইপ চেহারার দাম অনেক বেশি—যার ছাপ সহজে ভোলা শক্ত।

কোন চেহারা সিনেমায় চলবে এবং কার চেহারা অচল এ-সম্বন্ধেও কি আপনার কাছ থেকে আমার জানতে হবে।

জানেন আপনি অনেক কিছুই, কিন্তু জানতে আপনার হবে এখনও অনেক কিছু। জানবার কি শেষ আছে সত্যিই!

বলব কি তোমাদের একটা আঠারো-উনিশ বছরের ড্যাক্‌রা মেয়ে প্রায় ঘায়েল করে এনেছিল আমায়। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় বাঁচিয়ে দিলে টেলিফোনের ঘণ্টা। সেই একবার মনে আছে মনে মনে সত্যিই টেলিফোন যে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলবার যন্ত্র নয় তা সেই একবারই অনুভব করেছিলাম।

হ্যালো--কে?

অনাদি? কি ব্যাপার? আমার বন্ধু অনাদি ফোন করছিলো সেই সময়ে নীচে থেকে। একটি মেয়ে আমার সঙ্গে এপয়ন্মেণ্ট না করে আমার ঘরে বসে থাকায় আমার মেজাজ কি হয়েছে বোধ হয় এসিসটেণ্ট মারফৎ দরোয়ান অব্দি সে-খবর পৌঁছে গেছে। নীচে থেকে টেলিফোনে আমার সম্মতি না নিয়ে তারা আর কাউকে পাঠাতে রাজি নয় চাকরী খোয়া যাবার ভয়ে। না হলে অনাদিকে তারা জানে যে তাকে সোজাসুজি আমার ঘরে পাঠালে আমার দিক থেকে আপত্তি ওঠে না কোনদিন।

"ভাই—তোমায় বিরক্ত না করে পারলাম না। অনাদি বল্লে টেলিফোনেঃ ছেলেটাত গোল্লায় গেল।"

"সে ত অনেকদিনই গেছে—তার জন্যে আর নোতুন করে ভাবা কেন? তোমার আমার ছেলে গোল্লায় যাবে না ত যাবে কাদের ছেলে?

"না ভাই ঠাট্টা নয়। আমার একার ভাবনা হলে কিছুই ছিলো না। গৃহিনী তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না একেবারে। ছেলের জন্যে মেয়ে দেখছে আর ছেলের কোন মেয়েটিকেই মনে ধরছে না। ডানাকাটা পরীও নয়। হাল ফ্যাসানের এদেশ আর ওদেশের ককটেল করা সুন্দরীও নয়। তখন খোঁজ নিয়ে ব্যাপারটা জানলুম। একটি মেয়ে আমার ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছে। তোমাকে বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—

বুঝেছি, বুঝেছি ওপরে এস—পুরোটা শুনি—

ওপরে অনাদিকে ডেকে আনবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। মেয়েটির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সময়ের ঢাল মাত্র, যেখানে তার কথার তীর অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে যাবে, তারপর আড়ালে বসে আমি আর অনাদি তার ছেলের বিগড়ে যাওয়ার ঘটনা শুনব আদিকাণ্ড থেকে সুরু করে বর্তমান কাণ্ড পর্যন্ত, যতক্ষণে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে আর তারপর --

মেয়েটিকে বল্লুম ঃ আপনি একটু পার্টিশানের ওপারে গিয়ে বসুন। আমার বন্ধু আসছেন একজন, জরুরী কথা আছে। সুরঞ্জনা পাশের ঘরে চলে গেল নির্বিবাদে। গেল এমন ভাবে যে আমার সমস্ত উৎসাহ নিবে এলো মুহূর্তে, তার উত্তাপ গেলো ঠাণ্ডা হয়ে। দুদিন খেটেখুটে ষ্টুডিওর বাইরে একটা সেট তৈরী করেছি—হয়ত বাড়ীতে আগুন লাগাবার দৃশ্য—বরুণদেব আমার পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি ঢাললেন তার মাথায়, বল্লেন : আর দরকার নেই ; তখন মনের অবস্থা যেমন হয়—ঠিক তেমনি খারাপ মেজাজে বসে বসে আমি অনাদির অপদার্থতার আর আমার অতিরিক্ত আশাপরায়ণতার জন্য নিজেরই চুল একটি দুটি করে ছিঁড়তে লাগলাম।

অনাদি যা বল্লে তা থেকে বোঝা গেল ঃ তার ছেলে একটু বেশি-রকম বাড়াবাড়িই আরম্ভ করেছে। বাড়া থেকে রোজ সকাল দশটা

সাড়ে দশটায় বেরোয় অনাদির এক স্টিবেডর শ্যালক আছে তার ওখানে কাজ শিখতে যাচ্ছে এই অজুহাতে—আর ফেরে রাত এগারোটার ওদিকে। অনাদি এতক্ষণ কি কাজ হয় জানবার জন্যে খোঁজ নিয়ে শোনে মাসে তিনদিন ও ঘণ্টাঘানেকের জন্যে শ্যালকের জাহাজে যায় কিনা সন্দেহ, বাকী কদিন কাটায় অন্য জায়গায়। সেই অন্য জায়গার সন্ধানও অনাদি নিয়েছে। পতিতা নয় কিন্তু তার চেয়েও নাকি অধঃপতিতা এক মেয়েই কি করে না জানি তার ছেলেকে তুক করে বসে আছে।

জান সুব্রত অনাদি না থেমেই বলে, দু'একবার ঐসব খারাপ পাড়ায় সকলে মিলে একটু ফুর্তি-টুর্তির জন্যে যাওয়া আসা এমন কিছু নয়। কিন্তু যার পেছনে ছেলে ঘুরছে আমার, সে আরও মারাত্মক ; ছাপ মারা নয় বলেই ভয়ের বেশি। এখুনি কিছু করতে না পারলে আর কিছু কখনই করা যাবে না।

কিন্তু আমি,—আমি কি কোন কাজে আসবো এ-ব্যাপারে ?

কেন আসবে নাই বা কেন ?

কারণ ভালো ভালো পরিবারের ছেলে আর মেয়েদের প্রথম ফিল্মে এনে তাদের খারাপ করার বদনামই আমার আছে, বিপথে যাওয়া ছেলে কি আমার কথায় রাশ টানবে ?

'সে দেখা যাবে ঠিক সময়ে' অনাদি আমার আপত্তি গায়ে মাখলে না, তোমার কাছে আসার গৌণ কারণ এটা, মুখ্য কারণ হোল মেয়েটি তোমারই জগতের—অর্থাৎ ফিল্মে নামা ভদ্রঘরের মেয়ে। 'কি রকম' ঝিমিয়ে ছিলাম, উঠে বসলাম ঃ কে ?

দাঁড়াও দাঁড়াও ইনি কোন হিরোইন নন এখনও, ইনি সবেমাত্র ঢোকবার চেষ্টা করছেন, এখনও বোধহয় চৌকাঠ পেরোন নি। এর নাম, অনাদি নামটা যেন মনে মনে আউড়ে নিল, তারপর পরিস্কার ঘেন্নার সঙ্গে বল্লে, অপ্সরীটির নাম সুরঞ্জনা—সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়।

বসেছিলাম, দাঁড়িয়ে উঠলাম।

কি হে দাঁড়িয়ে উঠলে যে, চেনা কেউ নাকি ?

হ্যাঁ—না—ঠিকানাটা জানো ?

জানি—৫নং—একটা রাস্তার নাম বল্লে অনাদি। সে ঠিকানাটা বল্লে তোমরা সবাই এখুনি স্থরঞ্জনার ওখানে দৌড়বে বলে, সেটা এখানে উহ্য রাখলাম—সুব্রত একটু অপ্রস্তুত কোরল তার শ্রোতাদের।

বাইরে বৃষ্টির উন্মত্ত প্রলাপ শান্ত হয়ে এসেছে প্রায়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে নিয়ে তার এক রাতের প্রেমিকরা কখন উঠে গেছে আমরা খেয়াল করিনি। 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কোলকাতা কেন্দ্রও নিস্তার দিয়েছে তার শ্রোতাদের ঘণ্টা দশেকের মত। বয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হোটেলের মালিক এসে গেছে ক্যাশ মিলিয়ে নেবার জন্যে। টেবিলের ওপর মদের গেলাসের দাগ গোল হয়ে পড়েছিল যেখানে চার পাঁচটি, সেখানে এখন অসংখ্য চক্রাকার। একটি বেড়াল কাঁদছে হোটেলে ওঠবার একটুখানি রকে ল্যাজ গুটিয়ে বসে, অসময়ের ঠাণ্ডা অপ্রস্তুত আমাদের আদ্দির পাঞ্জাবীকে ঠাট্টা করে হাড়ে হাড়ে পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখাচ্ছে, ওপারের ফুটপাথে নিওন সাইনটা শুধু তখনও একবার জ্বলছে আর আরেকবার নিবছে আর তারপর আবার জ্বলছে। তু'একটি গাড়ী জল ঠেলে চলবার চেষ্টায় নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হোটেলের ভেতর পর্যন্ত। রিক্সার চালক আমাদের গল্পের পেছনে বাংলা সিনেমার ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকের মত যখন তখন বেপরোয়া টুং টাং আওয়াজ করে বছরের অসময়ের ফল পাওয়ার মত বৃষ্টির রাতে চড়া দামের খদ্দেরকে জল ঠেলে পার করবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত।

সুব্রত বল্লে : অনাদি চলে গেল এবং মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। কথাগুলো শুধু শুনেছে নয় গিলেছে বলে মনে হোল। কিন্তু এতটুকু অ প্রস্তুতির বা ধরা পড়ে যাওয়ার ভাব নেই মুখের কোথাও। মনে হোল মেয়েটি অভিনয়ের সম্বন্ধে যত লম্বা চওড়া কথা এতক্ষণ শোনাচ্ছিল বোধ হয় তার সবটাই মিথ্যে নয়। সে সময় তাকে আমার একজন খেলোয়াড় অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবার কোনও কারণ ছিলো না।

মেয়েটি আবার এসে আমার মুখোমুখী বসলে। কথা বলতে সুরু করা মাত্র লক্ষ্য কোরলাম এবারে গলার স্বর ভারি। চোখের পাতা চিকচিকিয়ে উঠছে। পাকা দাবা খেলোয়াড় চালবার আগে যেমন শেষবারের মত আরেকবার যাচিয়ে নেয় তেমনি আমার দিকে একবার চোখ ছুটো বুলিয়ে নিয়ে সেই মেয়েটি বল্লে: বিশ্বাস করুণ যে কটি কথা ওই ভদ্রলোক বলে গেলেন তার একটিও সত্যি নয়।

আপনার নাম আর ঠিকানাটা—সেটাও মিথ্যে বলছেন—একটা কাগজে সুরঞ্জনা তার নাম আর ঠিকানাটা লিখে টেবিলের ওপর রেখেছিলো আমি না এলে আপিসে, আমার জন্যে রেখে যাবে বলে, সেটা হাতে তুলে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস কোরলাম।

না, ওছাড়া আরো একটি কথা উনি ঠিক বলেছেন, ওঁর ছেলের ব্যাপারটা বিশ্বাস করুন ওঁর ছেলের মাথা আমি বিগড়োই নি। ওঁর ছেলেই আমার মাথা প্রায় খারাপ করে দেবার উপক্রম করেছে।

আপনার কথা বিশ্বাস করবার কারণটা কি?

কারণ, আপনাকে ভরসা করে বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না, তবু বলব আপনি যদি আমার বাড়ীতে একবার যান ত অন্তত এইটুকু আমি বোঝাতে পারব যে প্রেম কোরবার মত মানসিক অবস্থাও আমার নেই—

"বলব কি তোমাদের ভাই" সুব্রত উঠে বসলে, মেয়েটি আমায় পাক্কা আধঘণ্টা একটি বক্তৃতা দিলে যার সারমর্ম শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেলো। সুরঞ্জনার পেছনে অনাদির ছেলে নাকি আজ প্রায় আড়াই বছর ঘুরছে। প্রথম দেখা হয় একটি মহরতে তারপর থেকে গত কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি দিনও সে বাদ দেয়নি সুরঞ্জনার কাছে যেতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, একটা সন্ধ্যে গেলে আরেকটা সন্ধ্যায়। একটি ছুপুরের জন্যেও নিস্কৃতি দেয়নি সুরঞ্জনাকে। একটি অপরাহ্নও সায়াহ্নে গড়িয়ে যেতে দেয়নি অনাদির ছেলে, যেদিন সে তার আর্জি থেকে রেহাই দিয়েছে সুরঞ্জনাকে কোনদিন সুরঞ্জনার চোখকে তুলে নিতে দেয়নি তার চোখ থেকে। একবারও মনে হয়নি

তার যথেষ্ট করে বলা হয়েছে সেই একটি মাত্র বক্তব্য : আমাকে তুমি বিয়ে করবে সুরঞ্জনা ? প্রথম প্রথম তাকে বোঝাবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। সুরঞ্জনা বলেছে বিয়েতে মা-বাবার মত আছে কিনা আর সে যখন একমাত্র ছেলে অনাদির। সুরঞ্জনা তার নিজের যক্ষ্মারোগী ভাইয়ের কথা, বিধবা মায়ের কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে বিয়ে করে সুখী হবার জন্যে সে জন্মায় নি। তবু তবুও অনাদির ছেলে ঘুরেছে একটি হরিণীর পেছনে যেমন করে জয় করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ ধৈর্য্যের বাঁধ যার কখনো আলগা হয়নি সেই পুরুষ হরিণের মত, যাবার যারা তাদের যেতে দাও বলে হরিণীর জন্যে একা অপেক্ষা করে যে, যতদিন যতক্ষণ পর্যন্ত না হরিণী তার সম্মতি দেয়। সুরঞ্জনা অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে ছেলেটিকে। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত মেয়ে। সুরঞ্জনা যাদের পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয় যৌবনের জৌলুষে। ছেনালীর আর্টে। কিন্তু না। মাথা ঘোরে নি অনাদির ছেলের। মাথা বিকিয়ে দিয়েছে সুরঞ্জনার পায়ের কাছে। তারপর সুরঞ্জনা বুঝেছে এ-পাগলামী সারবার নয়। সরাবারও নয়। অনাদির ছেলে জীবনের অন্যান্য অভিশাপের মত একটি অভিশাপ। অনাদির ছেলের হাত থেকে বাঁচলে সুরঞ্জনা ভাগ্যের আর সব পরিহাসকে সারাজীবন ধরে স্বীকার করতে রাজি। কিন্তু সুরঞ্জনা রাজি হলে কি হবে ? তাকে ছাড়তে রাজি নয়। কি বলব অনেকটা অনাদির ছেলের মত হিপনটাইস্‌ড্‌ হয়ে গিয়ে কথা দিলাম। অনাদি আর আমি কাল যাব তোমার ওখানে। যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত কিছু করব।

এবং তারপর দিন গেলাম। যে-পল্লীতে আমার সেভ্রোলে গিয়ে ঢুকল সে পথে দিনের বেলায় কোনও ভদ্রলোক ঢুকবে না অনাদির ছেলেকে বাদ দিলে। সেখানে রাতের অভ্যাগতরা হয়ত আসে দিনের হতাশা ভুলতে। রাতের পরীরা চূণকাম করে দাঁড়ায় গলি জালনায় সারি দিয়ে, হাসে পান খায়। বিড়ি ফোঁকে। পানের দোকান থেকে গানের কলি উড়ে আসে চটুল ছন্দের হাল্কা বিকৃত উচ্চারণের গান।

আর হয়ত যুদ্ধ বাধলে আসে জীপ গাড়ী খাকি পোষাকে ক্ষুধিত জানোয়ারদের বয়ে নিয়ে। অনাদির সঙ্গে এখানে আসতে আমার মত নির্লজ্জ বেপরোয়া লোকেরও বাধবাধ ঠেকছিল। এ-কথা কবুল করতে লজ্জা পাচ্ছি না। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন দিনের আলো ম্লান হয়েও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। রাতের অন্ধকার গ্যাস-লাইটের তলায় এসে দাঁড়ায়নি। পল্লীমঙ্গল আসর সবে মাত্র সুরু হয়েছে। কুলপী বরফওয়ালা একটা হেঁকে যাচ্ছে যেমন হেকে যায় সে রোজ।

ঠিকানা মিলিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে যে আমাকে অভ্যর্থনা করলে তাকে প্রথম দেখে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। মেয়ে মানুষের চেহারা এত বীভৎস হয় ফিল্মলাইনে থেকেও তা আমার কল্পনার অনেক বাইরে ছিলো। চোখ ঢুকে গেছে প্রকাণ্ড ছুটো কুয়োর মত গর্তের মধ্যে। মুখের খানিকটায় ধবল আর খানিকটায় কালো মিলিয়ে জমকালো। নাকের পাশে আবের মত কালো আঁচিল একটা। হাতের চামড়া কুঁচকে কোথাও ধবলের জন্য সাদা হয়ে কালো রংকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। ব্লাউজের ছেঁড়া দিয়ে মনে হচ্ছে বুঝি বেরিয়ে পড়বে ছুটি মাংসের বেলুন। তারই চাপে কি বয়সের ভারে মেয়ে মানুষটি কুঁজো হয়ে গেছে অনেকটা। টকটকে লাল গামছা কি শাড়ি বোঝা যায় না তার চেহারার চেয়ে বীভৎস যদি কিছু সম্ভব হয়ত সে তার গলা। অত্যধিক শরীর দেওয়া নেওয়ায় শুনেছি মেয়েদের কণ্ঠস্বরে একটা পুরুষালি বিকৃতি আসে, অসম্ভব মোটা হয় তাদের গলার স্বর। আর মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যায়। তখন বেরিয়ে পড়ে মেকি আওয়াজ। মনে হয় মেঝের উপর দিয়ে কে ঘসড়ে নিয়ে যাচ্ছে ধারালো টিনের সিট। নার্ভে গিয়ে লাগে তার কাৎরানি। খানিকক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যেতে বাধে না।

কাকে চাই ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ফিরে যাবো কিনা ভাবছিলাম। অনাদি ফস করে জিজ্ঞেস করলোঃ সুরঞ্জনা বলে কেউ থাকে এখানে ?

থাকে না আবার খুব থাকে—জোর করে থাকে ; তিন মাসের ভাড়া না দিয়ে থাকে।

আছে সে ?

না—সন্ধ্যাবেলায় তার মানুষ আসে যে—তার পেয়ারের রাজপুত্তুর গো—নষ্ট মাগী লুটছে ত সেই ভালো মানুষের তুহাতে ; আমার ভাড়াটাও যদি দিত—উল্টে আমাকেই হুমকী দেয় গো—বলে উঠে যাবে। তা উঠে যা না ছুঁড়ি—মুরোদ দোখ—তিন মাসের ভাড়া বাকী রাখলে কে না গলায় ধাক্কা দেয় দেখি।

অনাদি সুরঞ্জনার পেয়ারের রাজপুত্তরের কথা শুনেই মুখ চোখ লাল করেছে। বুঝলাম রাজপুত্তরটি কে ? সে এবারে ফিরে দাঁড়ালো। আমি কিন্তু বল্লাম ঃ সে যে আসতে বলেছিলো আমাদের। ফিরবে কখন ?

তা ভগবান জানেন।

জেদ চেপে গিয়েছিলো। আমার মর্যাদায় ভীষণ ঘা দিয়েছে সুরঞ্জনা। আমায় সে ভুগিয়েছে। হেস্তনেস্ত করে যেতেই হবে। ওপরে উঠলাম বাড়ীওলীর সঙ্গে। ঘর খুলে দিয়ে সে আমাদের সাথেই ভেতরে এলো। আলো জ্বেলে দিলে কেরোসিনের ডিবোয়। সমস্ত ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। অসুস্থ রুগীর হতাশার মতো ম্লান বিষণ্ণ ঘরের আবহাওয়া। অসঙ্গতি শুধু একটা হারমোনিয়াম। ময়লা জামা কাপড় দড়ির ওপর একটা বেড়াল পেচ্ছাব করে গেছে—উৎকট গন্ধে নাকে রুমাল না দিয়ে বসা' অসম্ভব। দই মাখা চিড়ের একটা রেকাবীর ওপর মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে তখনও। ঘরের বাইরে অন্ধকার বারান্দা। খাটের ওপর ময়লা চাদর আরো ময়লা একটা তাকিয়া। গোটা তুই ওয়াড় খোলা বালিশ। একটা চ্যাপ্টা সস্তা কাঠের আলমারী —যার দরজাটা হাঁ করে আছে অসহায় দারিদ্র্যের মত।

মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া টিনের কাৎরানির মত মোটা থেকে হঠাৎ সরু পর্দায় নেমে আসা বাড়ীউলির গলায় তখনও সুরঞ্জনার প্রতি ঝাঁঝ উড়ে যায় নি। বাড়ীউলী বল্লে ঃ

ঢের ঢের মেয়েমানুষ এলো আর গেলো, এমনটি আর দেখিনি। আবার বল্লে ভদ্দরনোকের মেয়ে। ভদ্দরনোকের মাথায় মারি ঝাড়ু! শরীর দিয়েছি আমরাও বুড়ো মানুষকে মিছে কথা বল্লে ধম্মো অধম্মো নেই? মেয়েমানুষের শরীরে এত অধম্মো সইবে ভগবান। মুখে পোকা পড়বে বলে রাখলুম নইলে আমার নাম অন্নদা বাড়ীউলী নয়।

নীচে একটা আওয়াজ হতে অনাদি উঠে গেলো বারান্দায়। ফিরে এলো কিছু না বলে। বুঝেছিলাম প্রতি মুহূর্তে তার ভয় হচ্ছে এই বুঝি সুরঞ্জনাকে নিয়ে তার ছেলে ঘরে এসে ঢোকে।

বাড়ীউলী আশ্বস্ত করলে তাকে না জেনে: রাত বারোটার আগে সে ছুঁড়ী ফিরবে। শরীরও দিয়েছে ছুঁড়ীকে ভগবান। রাতে ঘুমোয় না দিনেও টো টো করে কোথায় ঘুরে বেড়ায়। বিরিশ্রাম নেয় না এতটুকু। না জানি কি রাজকায্যি আছে মর্দ্দমাগীর। বলি কোথায় ঘুরিস এতবেলা অব্দি। জবাব দেয় না হাসে। জবাব দেবার আছেই বা কি। ওর মনের মধ্যে সিঁধবার কার সাধ্যি। পেটের কথা যে মুখ দিয়ে বার করে না সে আবার মেয়েমানুষ।

রাত্তির নটায় পায়ের আওয়াজ পেলাম সিঁড়িতে। ঘরে যে ঢুকল সে অনাদির ছেলে।

সুরঞ্জনা কোথায়—অনাদি বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল।

সুরঞ্জনা? অনাদির ছেলে অবাক হল। বাড়ীউলী অনাদির ছেলেকে দেখেই লাফিয়ে উঠতে খাটের কোনায় মাথা লেগে পড়ে গেল মাটিতে। আর মাথা থেকে যেটা খসে গেল সেটা পরচুলা। নাকের পাশ থেকে আঁচিলটা ছিটকে গেল।

আমার হৃৎপিণ্ড বোধকরি গলার কাছে এসে আটকে গেছে।

কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো সুরঞ্জনা না?

হ্যাঁ আর বলে দিতে হবে না অবিকল সেই চেহারা। সেই কালো পুরু ঠোঁটের ওপর আরো কালো ছোট্ট তিল...

সুধা মাসী

সঞ্চারীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ভৈরবীতে।

নিউ-এম্পায়ারের ড্রয়িংরুম অডিটরিয়মে বসে শুনছিলাম মহালক্ষ্মী পাঠশালার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ভ্যারাইটি এনটারটেন-মেণ্টের প্রধান আইটেমঃ 'সঞ্চারী চৌধুরীর সেতার।' সঞ্চারী সেতারে আলাপ ক'রছিল ভৈরবী।

সঞ্চারী সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়ে যার রূপের তুলনা পাওয়া যাবে না কালিদাসের কোন নাটকে, অজন্তা-ইলোরার গুহাগাত্রে খোদিত নেই যার মত নিখুঁত গড়ন কোন দেহ। সেই যে এক মেয়ে যার গালের একটা তিলের জন্যে সমস্ত সমরকন্দ দিতে চেয়েছিলেন কবি, তিনি দেখেননি সঞ্চারীকে। তার কামনায় কালো বড় বড় হুটো চোখের মুহূর্তে শরীর অবসন্ন করে-দেওয়া কটাক্ষে সঞ্চারীর পায়ে সমস্ত পৃথিবী লুটিয়ে দিতে পারত যে-কোন বিশ্ব-বিজয়ী সম্রাট। সুনীতি চাটুয্যের শুষ্ক শব্দতত্বও সঞ্চারীর ঘণ্টার মত নিটোল কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হ'লে রবি ঠাকুরের মনে রাখার মত কোন কবিতাও তার তুলনায় মনে হত যেন ইস্কুল ছাত্রের টিউটরিয়েল ক্লাসের নীরস গদ্য। যামিনী রায়ের তুলিতে যতই এসে মিলত রং-এর পর রং, ধরা দিত না সঞ্চারীর দুধে-গোলাপে মেশান অঙ্গের বর্ণাভা। আলাউদ্দিন খাঁর সেতার থেমে যেত হঠাৎ যদি তাঁর বাজনার মাঝপথে এসে ঢুকত এই লঘুপদসঞ্চারিনী। মনে হত এতদিনের আরাধনায় যাকে পান নি, সারাজীবনের সাধনায় ধরা দেয় নি যে, বুঝি সেই এসেছে অমর্ত্যলোক থেকে মূর্তি ধরে। কৃতার্থ হ'তেন ওস্তাদ। ধন্য হ'তেন তিনি।

মজে গিয়েছিলেন সঞ্চারীতে, না, সঞ্চারীর বাজনায়, মনে নেই, আমাদেরই মধ্যে কে একজন বল্লেঃ আলাপ করা যায় না মেয়েটার সঙ্গে। বলা মাত্র পেছন দিক থেকে, একটি ভারি মোটা মহিলা কণ্ঠ

আমাদের সকলকে চমকে দিয়ে জবাব দিল: কেন যাবে না? আলাপ করতে চান, আসুন আমার সঙ্গে, সঞ্চারী আমার বোনঝি। আমাকে ডাকে সুধা মাসী বলে।

সুধা মাসীর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়।

(২)

সুধা মাসীকে আমার অল্প অল্প মনে পড়ে এখনও। পুরাণ মুছে-যাওয়া ছবির অতি পরিচিত ফ্রেমের মত, শুধু তার কাঠামোটাই এখনও মনে করতে পারি, মানুষটিকে নয়।

সেই সুধা মাসী··· ? আশ্চর্য!

বই-এর পাতায় দেহ-জিজ্ঞাসার কৌতূহল হয়ত মেটে কিন্তু জীবন জিজ্ঞাসার মেলে না হদিস। মানুষের মনের অন্ধকারে তারা সার্চ লাইট ফেলে না। ফেল্লে, আজও সুধা মাসী কেন আমার কাছে নিরুত্তর প্রশ্নের মত এসে দাঁড়ায়? তবে কেন, সুধা মাসী আমার কাছে একটুখানি আলোতে আরও অন্ধকার হওয়া ব্ল্যাক-আউট রাতের মতই রহস্যময়ী হয়ে রইবে? জীবনের প্রশ্নপত্রে যে অঙ্ক যত সহজ তার উত্তর তাহলে অত শক্ত হবে কেন? সুধা মাসীকে এখন কাছে পেলে এ-প্রশ্ন তাকেই আমি করতাম। উত্তর দিত কি দিত না সুধা মাসী তা জানি না, শুধু জানি যে উত্তর শোনবার পরেও সুধা মাসী আমার কাছে যে 'প্রশ্ন' ছিল সেই 'প্রশ্ন'ই থাকত। কিন্তু উত্তর জানা না থাকলে প্রশ্নের, কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই জেনেও আমার অনেক দুর্লভ অবসরের মুহূর্ত অকারণে উৎক্ষিপ্ত করেছে আমার মনকে। আমার অনেক কর্মদ্রুততায় এনেছে অবাঞ্ছিত অবসন্নতা। অনেক সিগারেটের আগুন পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে দিয়েছে দুই ঠোঁটের মাঝখানে নয় এ্যাসটের ওপর ফেলে রাখা বিস্মৃতিতে।

সে সব কথায় আজ আর কী-ই বা দরকার?—যেতে দাও সে-সব কথা আজ।

(৩)

হ্যাঁ, যা বলছিলাম।

সঞ্চারীর সঙ্গে সেদিন আলাপ করিয়ে দিয়ে সুধা মাসী নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের বাড়ীতে যাবার। ঠিকানা দিলেন উইলিয়মস্ লেন, কত নম্বর যেন। ইতিমধ্যে সঞ্চারী চৌধুরী সম্বন্ধে যতটুকু খবর পাওয়া গেল তা যেমনই উত্তেজক, তেমনই মুখরোচক।

(৪)

কালীঘাট রোড আর রাসবিহারী এভেনিউর মোড়ে, একটা বাড়ী, কিছুকাল আগেও যদি ওখান দিয়ে যাতায়াত থেকে থাকে আপনার, তাহলে আপনিও হয়ত দেখে থাকবেন যে একটা ফিকে হ'য়ে-আসা লাল একতলা বাড়ী হা হা করছে সব সময়ই এইমাত্র মোটর বেরিয়ে যাওয়া শূন্য গ্যারেজের মত। এখন অবশ্য তার ভগ্নাবশেষের ওপর উঠেছে ফুল-ছাওয়া তেতলা অট্টালিকা। কিন্তু কিছুদিন আগে ওই বাড়ীতে থাকতেন একজন সরকারী ডাক্তার, হরদয়াল চৌধুরী, কেওড়াতলা ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়া সম্ভব ছিল না যাঁর সম্মতি ছাড়া। এই হরদয়াল ডাক্তারের ওই ফিকে হয়ে-আসা লাল রংএর বাড়ীতে, সংসারে তাঁর নিজের বলতে ছিল না কেউ। মা-মরা একমাত্র মেয়ে, সেও থাকত মাসীর বাড়ীতে। মাসী ছিলেন বিলেত ফেরত ডাক্তারের স্ত্রী। নিজে ছিলেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বিদুষী ছিলেন তিনি। কালচার্ড নন শুধু, বিদুষীদের মতই ছিলেন অসাধারণ রকমের আগলী। হরদয়াল ডাক্তারের সেই একমাত্র মেয়ের নামই সঞ্চারী। আর তার মাসীই হলেন এই সুধা মাসী।

(৫)

সুধা মাসী শুধু কর্মক্ষেত্রেই হেডমিষ্ট্রেস নন, তিনি জন্মেছিলেনই মাষ্টারনী মন নিয়ে। উইলিয়মস লেনে প্রথম দিন যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা বোঝা গেল।

বিলেত-ফেরত ডাক্তারের বাড়ী থেকে ফেড আউট করেছে কবে উর্দিপরা বয় আর বাবুর্চি। ডিনার টেবলের বদলে এসেছে কাঠের পিঁড়ি। জানালার গা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে সিল্কের পর্দা। সেখানে শাড়ীর পাড়ের অদ্ভুত জোড়াতালি। ড্রয়িং রুম নেই, তৈরী হয়েছে ঠাকুর ঘর।

সুধা মাসী যাওয়া মাত্রই হাঁ হাঁ করে উঠলেন : জুতা বাইরে।

বাইরে জুতো ছেড়ে এসে বসলাম মেঝেয় পাতা আসনের ওপর।

সমস্ত ঘরটা কালী-দুর্গার ছবিতে মোড়া। মাঝে মাঝে ধর্ম্মের বাণী ছুঁচের মুখে ফুটে উঠেছে কাপড়ের ওপর, ফ্রেম করে বাঁধানো।

সঞ্চারী কোথায় ?

প্রশ্নের উত্তরে সুধা মাসী বল্লেন : ঠাকুর ঘরে, আসবার সময় হয়ে এল। বস একটু। চা দিতে পারব না, সরবৎ দিচ্ছি।

সত্যিই পাথরের গেলাসে এল লেবুর সরবৎ। সঙ্গে ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসা।

সঞ্চারী এল অনেক পরে। সুধা মাসীর বাড়ীতে সঞ্চারীকে মনে হয় যেন প্রজাপতির ডানা কে সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

কয়েকদিনের মধ্যে মাত্র সুধা মাসী পাগল করে দিলেন। সন্ধ্যেবেলায় গেলে শুনতে হয় গীতা, কোনদিন পাঁচালী, কোনদিন হরিকথা। সঞ্চারীর সঙ্গে বায়স্কোপ গেলে সঙ্গে যান। নাচ গানের জলসায় যেখানে সঞ্চারী সেখানেই তিনি।

মধ্য বয়সের বিধবা মহিলার শুচিবাই হয়, অন্ধ সংস্কার হয়, সাজবার বিকৃতি হয়, বৌদের ওপর অত্যাচার করে হয় বাসনার পূর্তি! কিন্তু স্বামী পুত্র নিয়ে স্বাভাবিক সংসারে এ কেমন অদ্ভুত অচরিতার্থতা ? চরিত্র রক্ষার জীবত নীতি শাস্ত্র। সর্বদাই ভয়, সঞ্চারীকে কে ভুলিয়ে নিয়ে গেল, সঞ্চারী এই বুঝি কার সঙ্গে প্রেম করল, সঞ্চারীকে কে বুঝি গোপনে জানালো অনুরাগ !

একদিন না পেরে সুধা মাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি সঞ্চারীকে নিয়ে আপনার এতই ভয় আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন কী ভরসায় ?

একটু চুপ করে থেকে সুধা মাসী বল্লেন: অডিটরিয়মে বসে যখন শুনলাম তোমাদের কথা-বার্তা তখনই মনে হ'ল তোমাদের সঙ্গে সঞ্চারীর আলাপ করিয়ে দিলেই তবে ভরসা, না হলেই বরং ভয়!

আরেকদিন সুধা মাসীকে বল্লাম: সঞ্চারীর বিয়ে দিয়ে দিন না, তাতে মেয়েটাও বাঁচে, আপনারও ভয় থাকে না আর!

সুধা মাসী বল্লেন: ওই একটি কথায় আমার কথা চলে না ভাই। ওর বাপ আর ওর মেসো দুজনেরই আপত্তি। বলেন, ওর কী বিয়ের বয়েস হয়েছে। শুনে আমি আর নেই। দশ বছরে না পড়তেই ফ্রক ছাড়িয়ে শাড়ী ধরিয়েছি—আর ঐ বাড়ন্ত শরীর, বলতে নেই আজ মঙ্গলবার, তবু বলছি ওই রূপ, ওর বিয়ে দেবার সময় অনেক দিন হ'য়ে গেছে, কিন্তু কেলেঙ্কারী একটা কিছু না হতে দিয়ে ওঁরা ছাড়বেন না জেনো।

সঞ্চারীর বিয়ে এখনও দিতে পারেন নি। এই দুঃখ, সুধামাসী পুষিয়েছেন অবশ্য, সঞ্চারীর দীক্ষা দিয়ে। সুধামাসীর গুরু সাক্ষাৎ সিদ্ধ পুরুষ, বেলেঘাটায় থাকেন, তিনি সঞ্চারীকেও দীক্ষা দিলেন। যাতে কোন কলঙ্ক আর না ছোঁয় তাকে। বল্লেন: যৌবন দুদিনের, জীবন অনন্ত, একথা ভুলো না মা।

(৬)

সুধা মাসীদের পূর্ব-ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করতে হল একদিন বাধ্য হ'য়েই। শুধু জানবার জন্যেই যে সুধা মাসী কী কারণে এত সন্দেহ বাতিক-গ্রস্থা হলেন। যা জানলাম তা সুধা মাসীর অস্বাভাবিকতার চেয়েও রোমাঞ্চকর এক ইতিবৃত্ত!

সঞ্চারীর মা'র রূপ ছিল যত, দম্ভ ছিল তত বেশী, আর ভাগ্য ছিল তত খারাপ। না হলে সুধা মাসী যিনি তার পাশে ছিলেন নিওন আলোর তুলনায় গরীব দোকানের পোষ্ট বোর্ডের বাক্সর মধ্যে লাল কাগজে মোড়া বালবের আলোতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত, সেই সুধা

মাসীর গলায় কেন তখন বিলেত যাত্রী অনুকুল হালদার মালা দেবে, ব্ল্যাক প্রিন্সে আর ক্রিসেনথিমামে মেশানো নিউমার্কেটের বহুমূল্য সওদা। আর উর্বশীর চেয়ে আকর্ষণ কম নয় যার, সেই তার বিয়ে হবে কেন হরদয়াল ডাক্তারের সঙ্গে, যার মূল্য অনুকূলের সওদার তুলনায় নয় বাসি গাঁদার চেয়ে বেশী।

নিজের বোনকেও তিনি এজন্যে ক্ষমা করেন নি। তিনি নিজে রূপ নিয়ে এসেছিলেন, তাতে তার কোন হাত ছিল না। তার বোন রূপ নিয়ে আসেনি, কিন্তু তার ওপর হাত লাগাতে চেয়েছিলেন সঞ্চারীর মা। সফল হন নি তিনি সেকাজে। মন্তব্য ক'রেছিলেন ঃ সুধা মাসী এক বাণ্ডিল ভিজে দেশলাই বাক্সের কাঠি মাত্র!—মশাল দিয়েও যাতে আগুন ধরানো অসম্ভব। তবুও মরবার সময় তিনি সঞ্চারীকে তার মাসীর হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, তার কারণ এক ঃ নিজের স্বামীর অপদার্থতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়তা, দুই ঃ সঞ্চারীর মাসী বড় লোকের বউ। সেখানে নিজের অপরিপূর্ণ কামনার পরিপূর্তি সম্ভব এ-পৃথিবীতে রেখে যাওয়া তার একমাত্র প্রতিভূর মধ্যে। আর, তৃতীয় আরেকটা উদ্দেশ্যও সম্ভবত তার ব্লাউজের হাতায় গোঁজা ছিল, যা আত্মপ্রকাশ করলে জানা যেত, যে তিনি সঞ্চারীর ভবিষ্যত স্বামীও যাতে তার বাবার মত অকেজো আর অকৃতার্থ না হয় সেই ঐকান্তিক বাসনার দিকে লক্ষ্য রেখেই গুমোট পচা ওই একতলা রং উঠে-যাওয়া বাড়ীর থেকে অনেক দূরে রাখতে চেয়েছিলেন কচি মেয়েটাকে।

সঞ্চারীর মাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন অনুকূল হালদার। সঞ্চারীর বাবার সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় কিনা ভাবতেন তাই। এমন কি বিয়ের পর যে কদিন তিনি এদেশে ছিলেন সে'কদিন মজে ছিলেন নিজের স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশী সঞ্চারীর মা-তে। অনেক অন্ধকার রাতে সুধা মাসীর প্রায় পুরুষ মানুষের মত শরীরের স্পর্শে ব্যর্থ তার কামনা জড়িয়ে থাকত একটি স্ত্রীলোকের কল্পনাকে ঘিরে, হরদয়াল ডাক্তারের পাশে যে ছটফট করত কণ্টকশয্যায়। সারা দিনের টুকিটাকি কাজের ফাঁকে, গাছ থেকে জানালায় উড়ে-এসে-বসা পাখীর

মত, সামনে এসে দাঁড়াত একটি কামনায় পুরু ঠোঁট, উপচে পড়া বুকের লাল সাদায় মেশানো বুকের ওপর অল্প অল্প দোলা-লাগা সোণার হার, আর যৌবনের ভার যেন বইতে না পারা কম্পিত নিতম্ব, একজোড়া কথা কওয়া চোখ, ভরা দুপুরের ঘুম থেকে ওঠা ইষৎ আলস্য-জড়িত পায়ে পায়ে যেতে বেজে উঠত অদৃশ্য বাসনার নূপুর নিক্কণ।

কিন্তু অনুকূল হালদার বিলেতের ডিগ্রী দেশী নামের পাশে দাগিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে আবার পা দেবার আগেই, সঞ্চারীর মা মারা গেলেন সঞ্চারীর ভার সুধা মাসীর হাতে তুলে দিয়ে। বাড়ীতে ফিরে এসে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন অনুকূল হালদার। নিজেকে মনে হ'ল রিক্ত, জীবনকে ব্যর্থ। সুধা মাসী বুঝে নিলেন অনুকূল হালদারের সঙ্গে ঘর করাই চলবে, মন পাওয়া অসম্ভব।

আস্তে আস্তে সঞ্চারীর মা'র উপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা তীব্র হ'য়ে জাগল সুধা মাসীর মনে। শোধ তুল্লেন সঞ্চারীর ওপর দিয়ে। সঞ্চারী ভর্তি হ'য়েছিল লরেট'য় মাতৃভাষা দ্রুত ভোলবার জন্যে। পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজী গান গাইবার প্রথম পাঠ দেবার জন্যে এল নোরা ব্রিটন। ঘুমোতে যাবার আগে মাসীর গালে রুজরক্তিম ঠোঁট দিয়ে বলতে শিখল : শুভ রাত্রি। সকালে খেতে শিখল ব্রেক ফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, রাত্রে ডিনার। সেণ্ট জেভিয়ার্সে সেক্সপীয়রের নাটক দেখে এসে অনুকরণ করে দেখাল হুবহু সুধা মাসীকে। বিলাতি রেকর্ডের তালে তালে পা ফেলতে শিখল দশ বছরের এ-প্রান্তেই।

তারপরেই একদিন বেঁকে বসলেন সুধা মাসী। লরেটো ছাড়িয়ে ভর্তি করলেন মহালক্ষ্মী পাঠশালায়। ফরাসীর বদলে আরম্ভ হ'ল, অস্তি গোদাবরী তীরে। রাতে মেঝেয় বসে গান শোনাতে হ'ল তার মেসোকে একলা ঘরে ফেলে রেখে যাওয়া শূন্যতায়, জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস। আসা যাওয়া শুরু করল কালীঘাটের ভুলে যাওয়া ঠিকানায়। দেখা শুনো আরম্ভ করল অবহেলিত বিপত্নীক হরদয়াল ডাক্তারের। শ্মশানের ডাক্তারের মৃতপ্রায় সংসারে নিয়ে এল ইউক্যালিপটাসের নয়, বকুল ফুলের গন্ধ। জ্বলে যাওয়া মরুভূমির

মাথায় ভেসে এল এক টুকরো মেঘের মত। প্রেতপুরীর নিস্তব্ধতায় বেজে উঠল অর্কেষ্ট্রার মত নয়, বাঁশীর মত। তবু শান্ত হলেন না সুধা মাসী। দু'হাতে পিষতে থাকলেন একটা তাজা ফুলকে উৎকট আনন্দে, পৈশাচিক বীভৎসতায়। নাটকের প্রায় জমে উঠবার আগের অঙ্কে এসে ঢুকলাম আমরা। ওদিকে নাটক জমল কয়েক দিনের মধ্যেই, সঞ্চারীর গানের মাস্টার রাখা নিয়ে।

(৭)

সুধা মাসীর সব চেয়ে আপত্তি গানের মাস্টার রাখায়! তাঁর ধারণা ওই পথেই খাল কেটে কুমীর ঢোকে। সব পাহারা ব্যর্থ হয়, সতর্কতার মানে থাকে না আর, সব চেয়ে অনিরাপদ হয় সব চেয়ে কড়া কয়েদখানাও। কিন্তু সঞ্চারীর মেসো কিছুতেই শোনবার পাত্র নয়, এতদিন সয়ে সয়ে এতদিনে ক্ষেপে গেছেন তিনি। একজনের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট করবার কোন অধিকার নেই সুধা মাসীর, এ-কথা জানাতে কেন জানি না, আজ আর ভয় পাননি তিনি। মাস্টারও জোগাড় হয়েছে। শুধু বয়সটাই হয়েছে মারাত্মক। অশোকের বয়স বাইশ, সঞ্চারীর ষোল।

অবশেষে সুধা মাসী গেলেন গুরুর কাছে। তিনি ছাড়া এ-বিপদে পরিত্রাতা কে? নিয়ে গেলেন সঞ্চারীকেও। গুরু নির্দেশ দিলেন, সঞ্চারী গান শিখুক ক্ষতি নেই, কিন্তু মাসী যেন সারাক্ষণ বসে থাকে গানের সময়ে। আর গানটানগুলো একটু আধ্যাত্মিক ধরণের হলেই মঙ্গল হয় সব দিক থেকে।

(৮)

বহাল হ'ল অশোক। গান শিখতে সুরু করল সঞ্চারী। পাহারায় বসলেন সুধা মাসী। কড়া পাহারা, জেলখানার চেয়েও অধম। বাথরুমে পর্যন্ত যান না, গান শেষ হ'য়ে গেলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন অশোককে। দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা।

তারপর একদিন সঞ্চারীও আর পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল। বল্ল : হয় সুধা মাসীর কাছ থেকে আমায় সরিয়ে নিয়ে যান, আর নয় এসিড-ট্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিন আমার এই মুখ, রূপের জন্যই ত' এত। ষোল বছরের সঞ্চারীকে মনে হ'ল উর্বশীর অভিশাপ।

ঠিক করলাম, আর নয়। সুধা মাসীকে বলতেই হবে গানের মাস্টার অশোকের সঙ্গে না হয় সঞ্চারীর বিয়ে দিয়ে দিন, মেয়েটা বাঁচুক। কিন্তু বলতে আর হ'ল না। সুধা মাসীই বলার হাত থেকে রেহাই দিলেন।

(৯)

যেদিনকার কথা বলছি, প্রতি সন্ধ্যার মতই, সঞ্চারী অপেক্ষা করছে অশোকের জন্য তানপুরা নিয়ে, অশোক এলেই মাসীকে খবর দিতে হয়, তখন তিনি এসে বসেন! ছ'টা গেল, সাতটা গেল, আটটায় উঠে পড়ল সঞ্চারী। মাসীকে অশোকের না আসার খবর দিতে গিয়ে বাড়ীর কোথাও পেল না। অবাক হ'ল সঞ্চারী, কিন্তু বুঝল না কিছু। বোঝা গেল রাত এগারোটার সময়। সুধা মাসীর চিঠি পাওয়া গেল যখন। ছোট্ট চিঠি। নীতি-অন্ধ, যৌবন-অতিক্রান্ত, পাঁচ ছেলেমেয়ের মা, সঞ্চারীর অভিভাবক সুধা মাসী সেই ছোট্ট চিঠি লিখে জানাতে চেয়েছেন, অশোকের সঙ্গে তিনি এ-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন চিরদিনের মত। তাঁর খোঁজ করা না হয় যেন, আর করেও লাভ হবে না কিছু।

বহুদিন জানতে ইচ্ছে করেছে, সঞ্চারীর সুধা মাসী সেই চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে সঞ্চারীকে কোন সাবধানী বাণী জানিয়ে গিয়েছিলেন কি না যে তাঁর অবর্তমানে সে যেন বিপথগামী না হয়,—লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারি নি।

স্থুল

সহসা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই।

মাথায় পাঁচ ফিটের কিঞ্চিৎ কম। কোমরের উপর হইতে উন্মুক্ত অর্ধাঙ্গ বিস্তৃতিতে মানুষের কল্পনার শেষ সীমা ছাড়াইয়াছে। লোমষ কালো উদরের স্ফীতি ভয়াবহ। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হয় বুঝি এখনই ফাটিয়া পড়িবে। দূর হইতে কৃষ্ণবরণ একটি জালাকে নড়িতে দেখিবার পর ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। কাছে আসিলে তবে তুটি ছোট ছোট চোখ নজরে আসে। প্রায় সমতল নাকের সীমানা সমস্ত মুখ-ব্যাপিয়া গঙ্গা-রামের চেহারাকে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।

মানুষের শরীরে যে এত চর্বি জমিতে পারে শুধু চোখে দেখিলে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যায় না, বোধ করি সেই কারণেই দূর হইতে গঙ্গারামকে দেখিবার জন্য দক্ষিণা দিতে কাহারও কার্পণ্য নাই। এমন কি কলিকাতার মতো সহরে যেখানে বাহুল্যের জন্য বৈচিত্র্যকেও অতি সাধারণ, একেবারেই গতানুগতিক বলিয়া সন্দেহ করা অসম্ভব নয়, সেই রাজধানীর ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, অগণিত মহিলা ও পুরুষের অবিরাম পৃষ্ঠপোষতা ধন্য 'মেরিলিবোর্ণ ক্যার্ণিভ্যালের' অন্যান্য আয়োজন কাণা করিয়া দিয়াছে একা গঙ্গারাম। আয়োজন আয়তনে ও বৈচিত্র্যে বিপুল। কাষ্ঠনির্মীত চলন্ত অশ্বে ঘুরিবার তুর্নিবার বাসনা অথবা নাগরদোলা কিম্বা ছোট ছোট গাড়ীগুলিতে ঘুরিবার আশায় ছেলে-মেয়েরা আসে সত্য কিন্তু একবার গঙ্গারামের ঘরের মধ্যে ঢুকিলে সহজে তাহাদের বার করা শক্ত। আর নূতনতম ফ্যাশনের জয়ধ্বজা অঙ্গে-উড্ডীন যাহাদের সেই মহিলারও কি এক যাতুমন্ত্রে আটকা পড়েন গঙ্গারামের তাঁবুতেই। সঙ্গে যাহারা ছিলেন তাহারা মুখে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও আসলে গঙ্গারামকে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই অন্যত্র যাইবার সময় পান না। এমন কি ক্যার্ণিভ্যালের প্রধান আকর্ষণ

জুয়ার আড্ডা আজ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে গঙ্গারামের প্রতিদ্বন্দ্বি আকর্ষণের মহিমায়।

'মেরিলিবোর্ণ কার্ণিভ্যাল' যেমন আসলে ইহার নাম নয় তেমনই একদা অমল দাস আজ নাম বদলাইয়া গঙ্গারামে পরিণত হইয়াছে। কল্যাণপুর গ্রামের হরদয়াল সাহার 'সাহার মেলা' বহু গ্রাম ঘুরিয়া উপসহর পাড়ি দিয়া আজ রাজধানীতে আসর জমাইতে আসিয়াছে, সেই সঙ্গেই প্রয়োজন হইয়াছে নাম বদলাইবার। ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের বক্ষে বসিয়া 'সাহার মেলা' শুনিয়া নাক সিঁটকাইবে যাহাদের এবং তুই আনা খরচা করিয়া আসিতেও সম্মানে বাধিবে "মেরিলিবোর্ণ ক্যার্ণিভ্যালে" দশ টাকা দিয়া যাইতে তাহারা তুইবারও চিন্তা করা আবশ্যক মনে করে না। কিন্তু অন্যান্য আয়োজন না করিলেও বোধ করি চলিত। অন্তত হরদয়াল সাহা গঙ্গারামের তাঁবুতে ভীড়ের বহর দেখিয়া তাহাই মনে করেন । কে জানিত সৌখীন আর রুচিবাগীশ কলিকাতার বাবুরা মোটা গঙ্গারামকে দেখিবার জন্য গরমে ভীড় ঘেঁষা-ঘেঁষি উপেক্ষা করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারে। অসম্ভবই বা কেন? অন্যান্য যা আয়োজন সহরে তার এত বাহুল্য যে হয়ত ইহাদের চোখ হইতে তাহাদের নেশা টুটিয়া গিয়াছে। কিম্বা মানুষের দৈহিক বিকৃতিতে মানুষ যত আনন্দ পায় অন্য আর কিছুতেই তাহা সম্ভব নয়। খোঁড়া অথবা কালা, কিম্বা চার হাত অথবা তিন পা, মানুষ নিজে যাহার জন্য বিধাতাকে অভিশাপ দেয়, অন্য মানুষেরা প্রাণ দিয়া হয়ত তাহাই উপভোগ করে।

গঙ্গারামের তাঁবু হইতে ফিরিয়াই হরদয়াল আজ নিজে বিজ্ঞাপনের কপি লিখিতে বসে। ভুল হইয়াছে; মস্ত ভুল। ঘোড়া নাগরদোলা আর নয় শুধু "মোটা মানুষের" বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, জোরালো ভাষায় চমকপ্রদ বিশেষণ। "মোটা মানুষ", "মোটা মানুষ" "মোটা মানুষ" —নিজে আসিয়া দেখিয়া যান। "প্রকৃতির পরিহাস, বিধাতার সৃষ্টি।" কাগজে ঘোড়ার গাড়ীতে ব্যাণ্ডের সাহায্যে হ্যাণ্ডবিল আর পোষ্টারে কলিকাতার পথের উপর আওয়াজ দিয়া ফিরিতে থাকে 'মেরিলিবোর্ণ ক্যার্ণিভ্যালে'র মোটা গঙ্গারামের বিচিত্র ইতিহাস।

দিনের পর দিন ভীড় বাড়িতেছে! ছোট্ট একটুখানি ঘরের বাইরে বাঁশ দিয়া সীমানা করা হইয়াছে। মাথার উপর একটুখানি ঢাকা। সেই প্রায় উন্মুক্ত স্থানে সহস্র বিস্ফারিত নয়নের দৃষ্টির সামনে স্থির হইয়া বুদ্ধের মত বসিয়া আছে গঙ্গারাম।

সকলের চোখে আশ্চর্য্য কৌতুক। ভীড়ের মধ্য হইতে একজন কাঠি দিয়া গঙ্গারামকে খোঁচা দিল—"তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?"

একটি বিপুল অট্টহাসির শব্দে মাথার উপরের চাল খসিয়া পড়িবার উপক্রম।

"এই ওকে খুঁচিও না"—ক্যার্ণিভ্যালের একটি লোক বলে। গঙ্গারাম কিছু বলে না শুধু হাসে। বলিবার তাহার আছেই বা কি? সাহা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। না হইলে আজ মরিতে হইত। কিন্তু তবুও সকলের সামনে এই ঈষৎ খোঁচায় তাহার কিরূপ খারাপ লাগিল। খারাপ লাগিলে চলিবে না। সকলের উপভোগের বস্তু সে। তাহার নিজের উপভোগ্য না হইলেও বলিবার কিই বা আছে।

ওদিকে এংলোইণ্ডিয়ান একটি মেয়ে আসিয়াছে আরেকটি ছোকরার সহিত। মেয়েটির ব্লাউজ ছোট, গলা হইতে কাটা। ঈষৎ স্ফীত ঊর্ধ্বমুখী বুক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গারাম তাকাইয়া দেখিল হাসির দমকে সঙ্গের যুবকটির কনুইয়ের সহিত অবিরাম স্পর্শ লাগিতেছে। অবিমিশ্রিত লালসায় গঙ্গারামের চোখ দুটি চকচক করিতে লাগিল। মেয়েটির দিকে তাকাইতে শুনিল: "How funny"—তাহার পর ছেলেটির গায়ে গড়াইয়া পড়িল হাসিতে হাসিতে। গঙ্গারাম শুধুই funny! মূহূর্তে চোখ ফিরাইয়া লইল গঙ্গারাম। আর তাকাইবার প্রয়োজন নাই।

কে একজন মন্তব্য করিল: "মোটা ক্ষেপেছে।" অন্যদিকে একটি লাবণ্যময়ী বর্ষীয়সী বধূ আসিয়াছে দামী জড়োয়া গহণায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া। সঙ্গে একটি ছেলে। বয়স সম্ভবত এগারো কি বারো। ছেলেটির দিকে চোখ পড়িতেই সমস্ত জীবনের বিপুল ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস গঙ্গারামের স্মৃতিতে ভীড় করিয়া আসিল!

তাহার 'কমল-মণি' একমাত্র ছেলে গঙ্গারামের আজ নিশ্চয়ই এত বড়ই হইয়াছে। হয়ত এমনি আশ্চর্য্য লাবণ্য ভরিয়া আছে তাহার কিশোর ঘন কালো দুটি চোখ। আরো ভাবিত গঙ্গারাম। ছেলেটি কি যেন বলিতেছে। গঙ্গারাম শুনিল—পদ্য আওড়াইতেছে সে।

'এই মোটা গঙ্গা,—হয়তো আরো কিছু বলিত কিন্তু বর্ষিয়সী বধুটি হঠাৎ বলিলেন, "ছি, অমন করে বলতে নেই খোকা" চোখে সেই করুণ কালো ছায়া; স্থূলোদর, কুৎসিত, শ্রীহীন গঙ্গারামের গাল দিয়া চোখের জল অকারণেই গড়াইয়া পড়িবার আগেই মুছিয়া ফেলিল দুই হাতে। হাসাইবার কথা যাহার লোককে তাহার চোখের জল দেখিলে কেহই ক্ষমা করিবে না। থাকিয়া থাকিয়া গঙ্গারামেব চোখ দুটি শুধু চিকচিক করিতে লাগিল।

হরদয়াল সাহার মাথায় সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গঙ্গারাম ক্ষেপিয়াছে। গঙ্গারাম চলিয়া যাইবে। প্রথমে হরদয়াল যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ঠিক নয়, মাহিনা দ্বিগুণ ও আরো উত্তম আহারের প্রলোভন শুধু ব্যর্থ হয় নাই তাহাতে গঙ্গারাম প্রায় মারিতে উঠিয়াছে। তাহার পর অনুনয় বিনয় ও সকাতর প্রার্থনায় যখন কাজ হয় নাই। তখন হরদয়াল রাগিয়া বলিয়াছে। "জেল থেকে বেরিয়ে পথে পথে মরছিলে তখন এনে জায়গা দিয়েছি; আজ তুমি আমায় অপমান না করে কৃতজ্ঞতা জানাবে কি করে? যাও, তোমার মত জরদগবকে কে বসে খাওয়ায়—আমি শুধু তাই দেখবার জন্যেই বেঁচে থাকব।"

গাল দিয়াই হরদয়াল বলিলেন ভুল হইয়াছে! ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দেরী না করিয়াই গঙ্গারামের দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—"না খেতে পেয়ে মরে যাবো গঙ্গা। বুড়ো বয়স না খেতে পেয়ে মরব।" অবশেষে গঙ্গার সহিত একটা বোঝাপড়া হইল। একমাস পর গঙ্গা আবার কিরিয়া আসিবে—হরদয়াল সাহার কাছেই।

ক্ষুণ্ন মনে ফিরিতে ফিরিতে হরদয়াল মনে মনে বলিলেন গঙ্গাটা

একেবারে পাগল। ষাট বৎসরের দীর্ঘ তিক্ত ব্যবসাগত অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে লোক বসিয়া বসিয়া রোজগার ত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্রকে দেখিবার তুচ্ছ বাসনায় চাকরী ছাড়িবার কল্পনা করিতে পারে হরদয়ালের হিসাবে সে পাগল না হইয়াই যায় না। অথবা অন্য কেহ ফুসলাইয়াছে। কিম্বা হয়ত নিজেই মেলা খুলিবে। হ্যাঁ—নিজের ঘরে আসিয়া হঠাৎ এতক্ষণে আলো দেখিতে পাইলেন তিনি! গঙ্গারাম যে ফিরিয়া আসিবে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। এতক্ষণে গঙ্গার মতলব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরেকবার ঝলসাইয়া উঠিল। তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নীচে শুইয়া আজ প্রথম গঙ্গারামের চোখে ঘুম আসিল না। থাকিয়া থাকিয়াই শুধু মনে পড়ে বর্ষিয়সী বধূটির সহিত সেই যে ছোট ছেলেটি আসিয়াছিল তাহারই ছবি। আর সেই মৃদু ভর্ৎসনা; ছিঃ অমন করে বলতে নেই।

মনে পড়ে গেল দশ বৎসব আগের ইতিহাস। সুরমার মত সুন্দরীর সহিত বিবাহ হওয়ায় গ্রামের লোকের ঠাট্টা: "বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা" কিন্তু তখনও গঙ্গারাম 'অমল' ছিল। ছেলেটি হইবার পর গঙ্গারাম বাড়িতে আরম্ভ করিল। জমিদার বাড়ীর ইস্কুলে তখন সে মাস্টার। ছেলেরা আড়ালে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই। কিন্তু প্রথম প্রথম গঙ্গারামের কিছুই মনে হয় নাই। তাহার পর হঠাৎ একদিন সুরমাও ঠাট্টা করিয়া বসিল! গঙ্গারামকে দেখিয়া তখন না হাসিয়া উপায় নাই। তবুও নিজের স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া কোন দিন হাসিবে—ইহা তাহার কল্পনায় ছিলো না। সুরমার সহিত তাহার বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল।

পথে বাহির হইলে ছেলেরা হাততালি দেয়। ইস্কুল ছাড়িতে হইল গঙ্গারামকে। ঘরে বসিয়া কাটাইল দুই বছর। এবং তাহার পর হঠাৎ একদিন সকালে সকলে জানিতে পারিল গঙ্গারাম উধাও হইয়াছে। তখন গঙ্গারামের ছেলের বয়স দু'বছর!

আজ হঠাৎ নিশীথ রাত্রির তারার দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল তাহার ছেলে হয়তো তাহাকে উপহাস করিবে না। একমাত্র

সেই আশা লইয়াই দীর্ঘ ছয় বৎসর বাদে গ্রামে ফিরিতেছে সে কাল। খোকা যদি তাহাকে আগলাইয়া রাখে তবে সমস্ত গাঁয়ের উপহাস —এমন কি খোকার মায়েরও—গঙ্গারামের গায়ে তা লাগিবে না! খোকা দেখিতে যে সুন্দর হইয়াছে ইহা সে কল্পনা করিতে পারে! একটি সুঠাম শ্যামল কিশোর—কল্পনা করিতেই গঙ্গারাম আর ভাবিতে পারে না! তাহার সমস্ত স্থূলত্বের আবরণের অন্তরালে তাহার খোকার স্পর্শ যেন পাইতে থাকে।

ট্রেনে উঠিবার পর প্রথম গঙ্গারামের সময়ের কথা মনে পড়িল। ট্রেণ ছাড়িতে পনেরো মিনিট আছে। ভীড় আছে, একটি সীটে চারজন অল্পবয়সী ছেলে একটুখানি জায়গা করিয়া বলিল, "বসবেন নাকি?"—গাড়ীশুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। সকলকে অবাক করিয়া দিয়া গঙ্গারাম তাহারি মধ্যে বসিবার চেষ্টা করিল। দুটি ছেলে হাসিতে হাসিতে অন্য বেঞ্চে উঠিয়া যায়। আজ ইহাদের উপহাসে বিরক্তি আসিল না গঙ্গারামের। আজ সে নিজেকে হাল্কা বোধ করিতে লাগিল।

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিবার পর হইতেই অস্থির হইয়া পড়িল গঙ্গারাম। কল্যাণপুর কতদূর?—যদি খোকা বাবাকে চিনিতে পারে? পারিবেই না ত—তাহার পর যখন মা আসিয়া প্রণাম করিবার পর বলিবে "তোর বাবা, প্রণাম কর খোকা।" তখন গঙ্গারামকে দেখিয়া সে কি ঘেন্না করিতে পারিবে। উপহাস করিবে কি আর সকলের মত?

খোকাকে বড় করিয়া তুলিবে গঙ্গারাম। খোকা তার গাঁয়ের সকলকে ছাড়াইয়া যাইবে। তাহার খোকার মত আরেকজনও হইবে না।

কল্যাণপুরে নামিতে রাত্রি হইয়া গেল। পথঘাট অল্প অল্প মনে পড়িতেছে। বাড়ীটা ষ্টেশনের নিকটেই—শুধু এইটুকুই মনে ছিল গঙ্গারামের, কল্যাণপুরের মাটিতে পা দিতেই গুণগুণ করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল সে। বাড়ীর দরজার সাম্নে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল

গঙ্গারাম। দরজা ধরিয়া ঠেলিতেই বামাকণ্ঠে বলিল যা ত' খোকা —দেখে আয় কে? বুক ফাটিয়া হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিল গঙ্গার। একটি অনন্ত মুহূর্ত! অতিক্রান্ত হইয়াও হইতেছে না।

লণ্ঠন লইয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল খোকা। গঙ্গা প্রায় চেঁচাইয়া উঠিতেছিল।—এ কি? তাহার খোকার শরীর বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই অসম্ভব বাড়। গলা মুখ বুক ভরিয়া আসিয়াছে। আর ভাবিতে পারিল না গঙ্গা। তাহার কঠিন হস্ত হঠাৎ খোকার কণ্ঠনালীতে চাপিয়া বসিল। স্তিমিত লণ্ঠনের আলোয় গঙ্গা যে হাসিতেছে তাহা দেখিবার মত আর কেহ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না।

এইমাত্র রায় লিখিয়া উঠিয়াছি। সিগার ধরাইলাম একটা। হ্যাঁ—আসামীর ফাঁসী ছাড়া আর কী হইবে? নিজের হাতে ছেলেকে হত্যা করিলে তাহার মৃত্যু ছাড়া আর কি পাওনা থাকিতে পারে? আর বাপ হইয়া নিজের ছেলেকে কেহ মারিতে পারে? গঙ্গারামের মত মানুষদের পৃথিবীতে বাঁচিতে দেওয়া উচিত নহে।

বোবা

সুকমল সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতাম যে সুকমল যদি কোনদিন হঠাৎ হার্ট-ফেল করে মারা যায়, তাহলে শুধু তখনই, সেই একবারই কেবল জানা যাবে যে সুকমলের হার্ট ছিল। কথাটা ঠাট্টা করে বললেও ঠাট্টা নয়। বরং সুকমল সম্পর্কে ওর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু ছিল না ; আজও নেই। কিন্তু সেসব কথা পরে।

সুকমল দে বললেই আজ আর কিছু বলতে হয় না। সুকমল দে-কে শুধু মাত্র স্বনামধন্য বললে বলা হয় না। শুধু নাম নয় ; তার বাড়ী ; তার গাড়ী সবই আজ লোকের মুখোরোচক আলোচনার বিষয়। সুকোমল দে-র নিজের জীবনে আনন্দ নেই। না থাক ; সুকমল সম্বন্ধে আলোচনা করে, অতি অল্পই যার সত্য আর অনেকই যার বানানো, লোকে আনন্দ পায়। সুকমল তাতেই বাঁচে ; তার থেকেই নিঃশ্বাস নেয়। সেই প্রেরণাই তার কদাচিৎ ঝিমিয়ে পড়া অস্তিত্বে নতুন করে উদ্যমের উৎস থেকে উপচে পড়া উদ্বৃত্ত জীবনী শক্তির জোয়ার আনে। সুকমল স্বগতোক্তি করে : Very Good.

আপনি নিশ্চই এতদিনে সুকমল সম্বন্ধে নানারকম আজগুবি গল্প শুনে কখনও অশ্চর্য, কখনও মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। তার ফুটপাথ থেকে প্রাসাদে পদার্পনের বিচিত্র ইতিহাস রোমাঞ্চকর। ইতিহাস না বলে তাকে কিংবদন্তী বলাই সঙ্গত। নিশ্চয়ই এ-কথা আপনার কানে গিয়ে থাকবে যে একদিন কলের জলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দু'ই দূর করে সিমেন্টের বারান্দায় রাত কাটিয়ে সহায়-সম্বলহীন সুকমল ধাপে ধাপে উঠছে আর্থিক আর সামাজিক সাফল্যের চূড়ায়। যে-মইতে পা দিয়ে উঠেছে, সেই মই-এর মাথায় পৌঁছে লোকে যা করে সুকমল তা করে নি। লাথি দিয়ে ফেলে দেয় নি মইকে ; ফেলে দেয়নি কারণ কোন দিন কোনও কারণে যদি যেখানে উঠেছে সেখানে না থাকতে পারে, যদি নেমে

আসতে হয় আবার নিচে তাহলে চূড়া থেকে একেবারে এক মুহূর্তে ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে যাতে লোক হাসাতে না হয় সেই আশঙ্কা স্মরণে রেখে সে কোনও মই-ই সরিয়ে দেয়নি। নামতে হয়, যে মই দিয়ে উঠেছে, সেই মই দিয়েই আস্তে আস্তে নামবে, লোক চক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাবে আবার। অবশ্য তার এ আশঙ্কা যে নিতান্তই অমূলক, সুকমল নিজের কাজ দিয়ে তা নিজেই প্রমাণ করেছে। যেখানে সে উঠেছে সেখান থেকে নীচের দিকে আর তাকাতে হয়নি তাকে। সেখান থেকে উপরে, আরও উপরে তার নিশ্চিত অগ্রগতিতে বাধা পড়েনি একবারও; শুধু তাই নয় লোকে যতই আশা করুক যে এবারে সুকমল পড়বে; যতবারই লোকে এ আশা করেছে ততবারই সুকমল আরও নূতন সাফল্যে তাকে চরম তামাশাই করে ছেড়েছে। এখন লোকেও আর সন্দেহ করে না। তারা জেনে গেছে সুকমল দে যেখানে আছে তার উপরে আরও ওঠার মত জায়গা থাকলে, সুকমল সেখানে উঠবে;' কিন্তু সুকমল যেখানে আছে, সেখান থেকে পড়বে না আর কোনদিন!

আমি বিখ্যাত আধুনিক সঙ্গীত শিল্পী সুকমল দে'র কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে। আধুনিক সঙ্গীতের ইতিহাসে এত দীর্ঘদিন ধরে সমান জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা আর যে কারুর পক্ষেই অসম্ভব ছিল এতকাল। জনপ্রিয়তার এই উত্থান এবং এই পতনের চিরাচরিত ইতিহাসে সুকমলকুমার আশ্চর্য, এবং অভাবিত এক ব্যতিক্রম। ঠিক এই মুহূর্তে কোনও জায়গায় হয় গ্রামাফোন রেকর্ডে, নয় রেডিওতে, নয় জলসায়, নয় কোন ফিলম পর্দায়, কিংবা কোনও শিক্ষার্থীর গলায় ধ্বনিত হচ্ছে সুকমলকুমারেরই কোন গান। এখনও, আজও কিছুদিন পর-পরই সুকমলের নতুন গান বাজারে বেরয়, কিন্তু সুকমলের কোনও গানই ত' কখনও পুরানো হয় না। তার হাজার বার বাজা পুরানো পচে যাওয়া রেকর্ড হাজার এক বারের বার বাজে; আর তাই শোনে লোকে এমন কান দিয়ে যেন তারা এইমাত্র সেই রেকর্ড প্রথম শুনেছে।

সুকমলকুমারের সাফল্যের আরব্যোপন্যাস আপনাদের কাছে পড়ে পুরানো হয়ে গেছে; কিন্তু তার অতীত ইতিহাস? সে সম্বন্ধে আপনাদের জানা যতটুকু, তার চেয়ে ঢের বেশি অজানা। কাগজের পাতায় সুকমলের যে সচিত্র জীবন বেরয়, তা সমস্ত খ্যাতিমানদের বেলায় যেমন হয়ে থাকে সুকমলের বেলাতেও তেমনি ভাবেই মেডটু অর্ডার। কাজেই সে জীবনী আপনাকে উৎসুক করতে পারলেও কৌতূহল নিবারণে নিশ্চয়ই অপারগ। এবং এ কথার কোন ভুল নেই যে সুকমল দের সংক্ষিপ্ত কিংবা পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনীতেও সুকমলকে পাবার আর সম্ভবনা নেই। করণ তার সরকারী এবং বে-সরকারী কোনও জীবনচরিত রচয়িতারাই আর কখনই সত্যের মুখ চেয়ে তার জীবনী লিখবে না; জীবনী লিখবে সুকমলের অসংখ্য অগণিত অনুরাগীর মুখ চেয়ে। সে জীবনী সত্য না হলেও চলবে, কিন্তু মুখ-রোচক না হলেও অচল হবে একেবারেই। আজকে তার অনুরাগীরা সুকমল সত্যি কেমন তা' জানতে চায় না; কেমন হলে তাদের মনের মত হয়, সুকমল সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরে তার সমর্থন চায় মাত্র। রক্ত মাংসের সুকমল দে-র চেয়ে তাদের কাছে অনেক সত্য সুকমলকুমার, —তাদের অনেক রূপকথার নায়ক!

আমরা যারা আসল সুকমলকে অনেকদিন ধরে জানি, আমাদের কথার আজকে আর কোনও দাম নেই। আমরা তার অনুরাগী ভক্তর দল নই; আমরা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

শুধু বন্ধু কথাটা ব্যবহার করলেই বোধ হয় ছিল ভালো। অন্তরঙ্গ কথাটা বুঝি একটু বেফাঁসই বোলে ফেললাম। সুকমলের বন্ধু হওয়াই শক্ত; অন্তরঙ্গ হওয়া অসম্ভব।

আমাদের মধ্যে আমার সঙ্গেই যদি তার কোনদিন অন্তরঙ্গতা হয়ে থাকে ত' থাকবে। আমার অন্যান্য বন্ধুদের ধারণা আমার কাছেই সে তবু কিছুটা তার মনের কথা বলত। আমার ধারণা অন্য। সুকমল দে-র মন বলেই কিছু ছিল না। আমার কাছে এসে সে তার মন বলে যাকে খুলে ধরত তা ছিল আসলে তার মুখোস। সাধারণ লোক

আসলকে ঢাকার জন্যে মুখোস আঁটে। সুকমল দে মুখোসকেই আসল জিনিষের অভাবে সম্বল করেছিল। এবং দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে তাকে প্রায় আসলের মতই প্রত্যয় দিতে ব্যর্থ হয় নি।

কিন্তু সবই ছিল,—এখন আর নেই। কারণ সুকমল আমাদের সবাইকেই ত্যাগ করেছে; আমাকেও। এই কাহিনী যদি তার চোখে পড়ে তবে সে, এখন আমাদের মুখ দেখে না; তখন নামও করবে না। যদিও এ-গল্পে যার কথা বলছি তার নাম সুকমল নয়, তার আসল নাম—। এ-গল্প পড়ে তার আসল নাম যদি কেউ না বুঝতে পারে তাহলে বুঝতে হবে এ গল্পই হয়েছে, আর কিছুই হয়নি। কারণ এ গল্পে শুধু তার নামটাই গোপন করেছি, যার আসল জীবন ছাড়া আর কিছুই আজ আর কারুর কাছে গোপন নেই। এখানে নামটাই শুধু আসল নয়; কিন্তু আর সবই আসল। সুকমল দে নাম দিয়ে যার কথা এখানে বলেছি,—আবার বলি, আসলে সে লোকটা এই।

আগে যদি বেফাঁস বলে থাকি, এখন, সুকমল দে আসলে লোকটা এই বলে বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই স্ববিরোধী কিছু বললাম। সুকমল দে আসলে কি তাই ত' জানি না। কোন অত্যন্ত গোপন কথা কারুর কাছে প্রথম প্রকাশ করবার সময় আমরা প্রায়ই যে ইডিয়মের স্মরণাপন্ন হই তা হল: 'আমি জানি আর ভগবান জানেন'! সুকমল সম্বন্ধে সত্যি কথা বললে এর উলটো করে বলতে হয় সুকমল আসলে কী, এ-কথা আমি জানি না এবং ভগবানও জানেন না। তবু তার সম্বন্ধে এতকাল পরে এই গল্প যে হঠাৎ ফেঁদে বসেছি তা একেবারে অকারণে নয়। তার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

সে প্রয়োজন আর পাঁচজনের কাছে কিছুই নয়; আমার কাছে সাঙ্ঘাতিক। আমার কাছেও হয়ত তার দাম এত হ'ত না যদি আমি গল্প লেখক না হয়ে উকীল, ডাক্তার ব্যবসাদার কি কেরাণী হতাম। তাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তেই ত' কত আশ্চর্য গল্প উপস্থিত! তবু তাদের সে গল্প অপরকে শোনাবার মর্মান্তিক দায় নেই। কিন্তু গল্প লেখা যার পেষা নয় শুধু, নেশাও; তার কাছে যতদিন, যতক্ষণ পর্যন্ত

না এই সব চরিত্ররা মাথা থেকে নেমে যাচ্ছে কলমের মুখে, ততক্ষণ মুক্তি নেই লেখকের।

ভূতে পাওয়া ব্যাপারটা বিজ্ঞানের যুগে অবিশ্বাসযোগ্য। তবুও বলছি পৃথিবীর সব দেশে সব লেখককেই ভূতে পায়। একেকটি মানুষের জীবন এমনভাবে পেয়ে বসে লেখককে যে, যতবার সেই সব মানুষ, সেই সব জীবনের কথা ভুলতে যায় সে, ততবারই তারা এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে; হাসায়; কাঁদায়; মুক্তি চায়।

সুকমলের গল্প তাই আজ না লিখে উপায় নেই। সুকমল যতদিন খুব কাছাকাছি ছিলো ততদিন কিন্তু সুকমলের গল্প কোনদিন লিখতে হবে ভাবিনি। সুকমলের জীবনে এত বড় গল্প ছিলো তাও যেন আমার কাছে এত স্পষ্ট ছিলো না। সুকমল যখন আস্তে আস্তে সরে গেল; ত্যাগ করল আমাকে; তখনই যেন সে সত্যিকারের পেয়ে বসল আমাকে। অনেকদিন ধরে সে একটু একটু করে চেহারা নিতে লাগল; স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। রক্ত-মাংসের রূপ নিলো। উদ্দাম হয়ে উঠল।

সুকমলের জীবনের যে অংশ এখনও অজ্ঞাত; তার সাফল্যের রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত নয়; তার খুব কাছের আলোকচিত্র এখানে তুলে না ধরে আজ আমার নিষ্কৃতি নেই। না; আলোকচিত্র নয়; পেরেছি কি না জানি না, কিন্তু যা এখানে দিতে চেয়েছি তা আলোকচিত্র নয়। সুকমলের মনের এক্সরে রিপোর্ট।

সুকমল যখন সুকমলকুমার হয়নি,—এই সেদিনও সুকমল আসত আমার আড্ডায়; আমি নিজে গান বাজনা না করলেও, আধুনিক গান গায় এমন কোনও ছেলে মেয়ে ছিল না সেই সময়ে যাদের না দেখা যেত আমার বাড়ীর বাইরের ঘরে।

সেই সময়েই সুকমলের প্রথম সজ্ঘাতিক জনপ্রিয় গান 'আমার জীবনে তুমি', রেকর্ড হয়েছে। শুধু রেকর্ড হয় নি। সেদিন পর্যন্ত বহু রেকর্ডের বিক্রয়-রেকর্ড ব্রেক করবার করেছে উপক্রম। এর আগে দশ বছর তার সঙ্গীত জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। দশ

বছর আগে গান বাজনা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টা করেছিল গাইয়ে হ'তে, পারে নি। প্রবেশ পত্রই পেয়েছিল কিন্তু বসবার অনুমতি পায় নি। তারপর দশ বছর ধরে সে ঘুরেছে কখনও এলাহাবাদে; কখনও লখনউতে; কখনও কানপুরে; কখনও জলন্ধরে। গান শিখতে নয়; কেরাণীর চাকরী করতে।

তারপর যখন সে আবার এসে পৌঁছেচে কলকাতায়, তখন তার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে; বিয়ে হয় নি। চাকরীর বয়স হয়ে গেছে দশ বছর। কলকাতায় পাড়ার এক জলসায় জোর করে একদিন ধরে নিয়ে গিয়ে গান গাইয়েছিলাম সেদিন আমিই। মন্দ গায় নি সুকমল। জলসার পর বাড়ী যেতে যেতে বল্লাম গান গাওয়া ছেড়ে দিলে কেন? লাগ না আবার! সুকমল কিছু বলল না, হাসল।

হাসল বটে সুকমল, কিন্তু আমার কথাটাতে যে সে সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দেয় নি তার প্রমান দিল সে কয়েকটা জলসায় পরপর গান গেয়ে। সুকমল দে সত্যি সত্যি আবার গাইয়ে হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল।

দু'খানা রেকর্ডও করল সে পরপর। এই সময়েই একটা জলসায় তার একখানা গান শুনে বললাম, এই গানটা রেকর্ড কর; লাগবে! সুকমল আমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে ফেলল: লাগবে? ঠিক বলছেন দাদা? সুকমলের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলাম বয়সে, তাই সুকমল বরাবর দাদা বলেই ডাকে। বললাম: নিশ্চয়ই লাগবে, তুমি যেমন করে পার, যত শিগগীর পার, একটা রেকর্ড করে ফেল।

সেই গান রেকর্ড করতে সুকমলকে কত নীচু হতে হয়েছিল সকলের কাছে, পরে তা সুকমলের কাছেই জেনেছিলাম। কিন্তু তাতে আমার কথাই ঠিক হ'ল। সুকমলের গান লাগল। সাঙ্ঘাতিক লাগল। প্রথমে যা ছিল মৃদু গুঞ্জন, পরে তাই গড়াল প্রচণ্ড হৈ-হৈ-তে। প্রথমে যা ছিল সখের প্রশংসা পরে তাই ফেটে পড়ল হাজার হাত-তালিতে। সুকমল প্রতিষ্ঠা পেল প্রথম শ্রেণীর প্রথমেই।

গান যে লাগল তার নিশ্চিত প্রমান পাওয়া গেল হাতে হাতেই।

সুকমলের বন্ধুরা সুকমলকে ত্যাগ করল। শত্রুসংখ্যা হল সংখ্যাতীত। গানখানায় সুর দিয়েছিল সুকমল নিজেই। শোনা গেল এ সুর তার নিজস্ব নয়; ধার করা। প্রথম প্রথম শোনা গেল; তারপর কাগজে কাগজে ছাপা হয়েও বেরুল। যারা ভাবতে পারেনি সুকমলের এই অভাবিত সাফল্য যারা সেই ভরসায় সুকমলকে ইতিপূর্বে তারিফ করেছে, সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল তারাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সুকমলের গানের রেকর্ডের বিক্রী বিশ্বাসের অঙ্ক ছাড়াল।

সেই সময় অর্থাৎ তার জীবনের এবং তার খ্যাতির মধ্যাহ্ন দিনে দ্বিতীয়বার যখন সে আসছে যাচ্ছে আমার বৈঠকখানায় তখনও পর্যন্ত কিন্তু তার সম্বন্ধে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি। অন্যরা যখন চলে যেত, তখন আসত সুকমল। সে স্পষ্ট করেই বলত: আপনার এখানে আসি কারণ জানি আপনি গান বাজনা করেন না; যেদিন খবর পাব আপনিও গান বাজনা ধরেছেন; সেইদিনই এই যায়গাও ত্যাগ করতে হবে! অন্য আর কোথাও আমার যাবার উপায় নেই; কারণ আমার নিন্দাই ইদানিং তাদের একমাত্র খোরাক; কাজেই আমি গেলে তাদের আডডাটাই মাটি হয়; সে আমি করতে নারাজ।

সত্যিই তাই। সুকমল আমার আড্ডায় আসত, আড্ডা ভেঙ্গে যাবার পর। বেলা সাড়ে বারোটায় ঘর ফাঁকা হ'ত। চান করে খেতে হয়ে যেত দেড়টা; এসে খবর কাগজটায় একবার চোখ বুলোব বুলোব করছি; সুকমল এসে হাজির। সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে আবার আড্ডাধারীরা জমায়েত হবার আগেই চলে যেত। যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ একাই সে জমিয়ে রাখত আসর। জিজ্ঞেস করত কোনও কোনও কথা কিন্তু আমাকে নয় যেন। কারণ তার জবাব সে নিজেই দিত। বুঝতাম সবটাই তার স্বগতোক্তি। আমি তার সাক্ষীগোপাল মাত্র।

একেকদিন সে আমাকে নিয়ে বেরিয়েও পড়ত রাস্তায়। একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। ল্যান্সডাউন মার্কেটে সুকমল আর আমি ঘুরছি। হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, পেছন থেকে পাঞ্জাবী ধরে সুকমল

টান দিতেই ব্রেক করলাম। স্যাৎ করে সুকমল আমাকে নিয়ে একটা থামের আড়ালে গিয়ে লুকলো। দেখি, একটু দূর দিয়ে দাশু চাটুজ্যে জিনিষ পত্তর মুটের মাথায় চাপিয়ে চলে যাচ্ছে হনহন করে। বললাম ঃ দাশু না? ডাকি? সুকমল ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে যেন আদেশ করল ঃ চুপ!

দাশু চলে যেতে দোকানীর কাছে নিজেই এগিয়ে গেল সুকমল। জিজ্ঞেস করল ঃ যে ভদ্রলোক এক্ষণি চলে গেলেন, ইনি তোমার দোকান থেকে মাল নিচ্ছেন কতদিন?

পুলিশী প্রশ্ন শুনে দোকানদার কিন্তু ঘাবড়াল না একটুও। বলল ঃ না নাম জানি না বাবুর; আমার দোকানে কদিন মাত্র মাল নিচ্ছেন; বোধ হয় পাড়ায় নুতন এসেছেন তবে হাঁ, বড় ভাল খদ্দের। সব চেয়ে দামী দামী মাল নেন, আর দাম নিয়ে ঝামেলা করেন না একদম।

সুকমলের জের কিন্তু শেষ হয় না তখনও ঃ মাসকাবারে দাম দেয় না—

না, না, জিভ কাটে দোকানদার ঃ নগদ কারবার পুরো। তারপর কী যেন মাপতে মাপতে এবারে সে-ই প্রশ্ন করে বসে সুকমলকে ঃ চেনেন না কি বাবুকে? 'না' বলেই স্যাৎ করে সরে যায় সুকমল আমাকে নিয়ে; যেমন করে দাশুকে দেখে থামের আড়াল নিয়েছিল, তেমনি করে আমাকে নিয়ে একেবারে বাজারের বাইরে গিয়ে হাঁপ ছাড়ে।

ব্যাপার কি বল ত? জিজ্ঞেস না করে পারি না আমি। দাঁড়ান বলছি, সুকমল যেন তখনও কিসের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তারপর কোন গূঢ় তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার আগে প্রত্যেকবার তার যে মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করেছি এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না, চোখ দুটোকে কুঞ্চিত করে এনে প্রায় বুজিয়ে ফেলা অবস্থায় সুকোমল বলল ঃ বুঝলেন না দাদা? দাশু চাটুজ্জ্যের আর সে অবস্থা নেই! জমি-জায়গা বাঁধা রেখে বিক্রি করে চলছে এখন! বড়লোকি বজায় রাখতে প্রাণান্ত হয়েও পোজ ছাড়ে নি দাশু; শুনলেন না, সব চেয়ে দামী

জিনিষ এখনও দর না করে কেনে ; কিন্তু আমি ত' জানি ওর হাঁড়ির খবর ; এখন নগদ কিনছে ক'দিন, তারপর মোটা বাকী রেখে এ-পাড়া ছাড়বে ; দরকার কী আমার পরিচয় আবার নতুন করে জানাবার ; চেনা আছে জানলে দোকানী আমাকেই চেপে ধরবে ; সে কী ঝামালো বুঝুন ?—না, ল্যান্সডাউন মার্কেটে ঘোরা বন্ধ করতে হলো দেখছি দাশুর জন্যেই !

মুহূর্তের মধ্যে সুকমলের অন্তঃস্তল পর্যন্ত যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আসল সুকমল এই-ই !

মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গেলাম দশ বছর আগের এলগিন রোডের এক সাহেবী-প্যাটানের বাড়ীর ড্রয়িংরুমে। ফিরে গেলাম অসাধারণ রূপবান আর দুর্লভ স্বাস্থ্যে শক্তিধর এক যুবকের কাছে। বিত্তবান। বিত্তবান এবং বন্ধু বৎসল। বন্ধু বৎসল বললে তাকে কিছুই বলা হয় না। বন্ধু-প্রাণ। বন্ধুদের জন্যে প্রাণ কেউ দিতে পারে সত্যি-সত্যি, এ কথা হয়ত অত্যুক্তি। কিন্তু প্রাণটুকু ছাড়া আর সবই দিতে প্রস্তুত ছিল দাশু চাটুজ্জ্যে। এবং দিয়েওছিল। দিয়ে একদিন নিঃস্বও হতে যাচ্ছিল। এবং তার জন্যে আর যারই বুক চড়চড় করুক দাশুর কপাল চিন্তায় কুঞ্চিত হয়নি কোনদিন।

এই দাশু চাটুজ্জ্যের কাছে যে-দুটি লোকের আজীবন কৃতজ্ঞ থাকলেও ঋণ শোধ হয় না, তাদের একজন ননী বাগচী ; অন্যজন সুকমল দে। দাশু নিজে গান গাইতে পারত না ; কিন্তু সুকমলকে গাইয়ে করবার জন্যে যথাসাধ্য খোয়াতে আপত্তি ছিল না তার। তারই জন্যে সে বসিয়েছিল নিজের বাড়িতে গানের স্থায়ী আসর। নাম দিয়েছিল 'অগ্রগামী'। সাপ্তাহিক অধিবেশনে গাইবার তালিকায় খ্যাত থেকে অখ্যাত বাদ ছিল না কেউ ; গাইয়েদের মধ্যে গলা শোনা যেত না, এমন ঈর্ষ্যাযোগ্য কণ্ঠ তখন ছিল না কারুর। তবে তাদের তালিকা ফি-সপ্তাহেই বদলাত ; অর্থাৎ এ অধিবেশনে একজন ; আর অধি-বেশনে অন্য। শুধু প্রত্যেক সপ্তাহেই গান গাইতে পেত যে, সে হচ্ছে সুকমল। সত্যি কথা বলতে কি যেন সুকমলকে সঙ্গীতের অপরিচিত

জগতে পরিচয় পত্র দেবার জন্যেই দাশুর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো!

এবং 'অগ্রগামী'র নাম ছড়াচ্ছিল আস্তে আস্তে। তারই সঙ্গে সুকমল দে-রও। তার গান শুনতে শুনতে এক সময়ে সবাই তাকে যেন বাধ্য হল গাইয়ে বলে মানতে। আর দাশুর সেই আনন্দ। সুকমল সে স্বীকৃতি পাচ্ছে তাতেই দাশু কৃতার্থ। এর জন্যে দাশু শুধু 'অগ্রগামী' প্রতিষ্ঠা করেই চুপ করে বসে থাকে নি; সুকমলের অগ্রগতির জন্যে যে রেডিওতে, গ্রামাফোনে, অন্যান্য আসরে, কোথাও ধন্না দিতে বাকী রাখে নি। এগুলো ছিল প্রচেষ্টার দিক; এর ওপর ছিল দায়িত্বের আরেক দিক। সুকমলের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা। সুকমলের বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। কলকাতায় বাড়ী ছিল তাদের। বাবার পেনসন ছিল; সুকমলের বড় সব ভাইদের ছিল ভালো মাইনের চাকরী। সুকমল তারই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে গান বাজনা করছিল। কিন্তু সুকমলকে বাড়ী ছাড়তে হলো। বাবা তার বিয়ে দিতে চাইলেন সুকমল রাজী হল না। বাবা তাকে চাকরী করতে বললেন; সুকমল চাকরীর চেষ্টা করল না। ভাইয়েরাও একদিন নোটিশ দিল; সুকমল এসে উঠল দাশু চাটুজ্জ্যের বাড়ীতে; বাড়ীতে শুধু দু'বেলা খাওয়া আর মাথার ওপর ছাদ ছিল; দাশুর বাড়ীতে এসে সুকমলের একখানা আলাদা ঘর হলো। ঘরের ফ্লাওয়ার ভাসে রোজ ফুল ফুটতে লাগল; কখনও চন্দ্রমল্লিকা; কখনও রজনীগন্ধা।

আপনারা এখন শোনেন যে সুকমল একদিন কলের জলে ক্ষুধা তৃষ্ণা দু'ই দূর ক'রে সিনেটের বারান্দায় রাত কাটিয়ে তবে গান বাজনা করেছে; তার মধ্যে সত্য শুধু ওই সুকমলের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হওয়া-টুকু! বাকীটা অনুরাগীদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। সুকমল বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছিল সত্য। কিন্তু নিরাশ্রয় হয়নি; আরও উত্তম ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। বাবার ভাত ডাল থেকে বঞ্চিত হয়ে বন্ধুর কালিয়া পেলোয়া মারতে তার বিবেকে বাধে নি; খেয়ে হয়নি বদহজম!

সুকমল সারাক্ষণ ঘা দিলেও, মাঝে মাঝে দাশুকে অন্যেরাও যে ঘায়েল করেনি তা নয়। ননী বাগচী ত' একাধিকবার দাশুর সই জাল করে স্লিপ দিয়ে দামী দামী বাজনার যন্ত্র বাকীতে দোকান থেকে নিয়ে বেচে দিয়েছে অবলীলাক্রমে। একবারের কথা মনে আছে। দাশু আর দাশুর নব পরিনীতা স্ত্রী ওপরের ঘরে বসে গল্প করছে। ধোপা ডেকে ডেকে দাশুকে নামাতে না পেরে, বাইরের ঘরে দামী সেই সব শাড়ী ফেলে দিয়ে দরজা খুলে রেখেই চলে গেছে। ননী বাগচী এসেছে একটু বাদেই। রিক্সা ডেকে শাড়ীর গাঁটরী নিয়ে সটান বেরিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে দাশুর বাড়ীতেই ফিরে এসেছে। গরম সিঙ্গাড়া আর চায়ের ওপর গল্প করেছে অনেকক্ষণ। দাশু পরে জেনেছে সব ; বলেনি কিছু।

বলে নি সুকমলকেও, যখন দাশুর বহু পয়সা ধ্বংস করবার পর সুকমল স্পষ্ট করেই একদিন বলল, গান বাজনা তাকে দিয়ে হবে না, তখনও দাশু রাগ করল না এতটুকুও। একখানা গান রেকর্ড করেছে সে, তারই ফলাফল হয়েছে বিপর্য্যয়ের কারণ। সুকমল নিরাশ হয়েছে, দিন্তু দাশু নয়। দাশু তাকে অনেক করে বোঝাল, কিন্তু কিছু হলো না। তখনও দাশুই কিন্তু তার শেষ উপকারটুকুও করল। একটা ভালো পাকা-চাকরী করে দিল সুকমলকে ব্যাঙ্কে। সেই চাকরী যখনকার কথা বলছি তখনও না ; এই সেদিন মাত্র ফিল্মে সঙ্গীত-পরিচালনার একটা মোটা টাকার কণ্ট্রাক্ট পেয়ে তবে ছেড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ছাড়বার আগে অবশ্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুদে আসলে আদায় করে নেবার পর তবে দিয়েছে পদত্যাগ পত্র, তার আগে নয়। কিন্তু তবু সুকমলের ওপর দাশুর টান তখনও অটুট।

এবং আজ যে দাশুকে দেখে সুকমল মুখ ঘুরিয়ে নিল, এ কথাও দাশুর কানে গেলে দাশু হাসবে ; কিন্তু রাগ করবে না। বরং এক-বার দেখা করবার জন্যে স্বাকার করবে যে কোন হীনতা। ভক্তদের সঙ্গে মেয়েদের কোথাও একটা মিল আছে। যাকে ভলোবাসে, সে

বিমুখ হলে, তাকে আরও বেশী ভালোবাসে। যে যত সর্ব্বনাশ করে, তার প্রতি তত সর্ব্বনেশে হয় আকর্ষণ মেয়েদের। মেয়েদের ; আর একান্ত অনুরাগীদের ; ইংরেজীতে যাদের বলে 'ফ্যান'।

বাজারের বাইরে এসে সুকমল আমাকে বাসে তুলে দিয়ে চলে গেল। বাসে আসতে আসতে সুকমলের সম্বন্ধে আমরা ঠাট্টা করে যা বলতাম মনে হলো তা নিছক ঠাট্টা নয়, সুকমল সত্যিই হার্টলেস। হৃদয়হীন নিজক স্বার্থের মাংসপিণ্ড! ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। সুকমল আমাদের ইস্কুলেই কয়েক ক্লাস নীচে পড়ত। একদিন তখন আমি বোধ হয় ক্লাস টেনে পড়ি, হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে ডাক পড়ল। কী ব্যাপার, বুঝতে পারছি না, এমন সময় বারান্দায় দেখি সুকমল দাঁড়িয়ে ; আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল : দাদা, হেডমাস্টার মশায় আপনাকে ডেকেছেন ? না ?

আমি ত' অবাক ; বল্লাম : তুমি কি করে জানলে ?

সুকমল বলল : আমার ব্যাপারেই ডেকেছেন কি না !

কেন ? তুমি কি করেছে আবার ?

না, না, তেমন কিছু নয় ; এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সুকমল এবারে বলল : মাইনে মাফ করবার জন্যে বাড়ী থেকে চিঠি দিইয়েছি ; আমার বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ; ফাঁসাবেন না যেন— !

সুকমলের মাইনে মাফ হলো, আমারই মিথ্যাভাষণের মহিমায়। মাইনে মাফ হবার কথা বাড়ীতে চেপে গেল সুকমল। বাড়ী থেকে পাওয়া মাইনের টাকা জমাতে লাগল সে। একদিন সুকমলকে বলেছিলাম : তোমার বাড়ীর অবস্থা যা তাতে তোমার মত আরও অনেকের মাইনের ব্যবস্থা হওয়া শক্ত নয় ; অথচ তুমি বিনা মাইনেয় পড়ো, সে টাকা জমাও আর বহু ছেলে মাইনে মাফ না করাতে পেরে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তা জানো ?

সুকমল বলল : জানি ; কিন্তু তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু জেনে ফেলেছি যে !

কী রকম ?

জানতে পেরেছি যে এ ইস্কুলে অনেক বড়লোকের ছেলেই শুধু বিনা মাইনেয় যে পড়ে তা' নয় ; তারা বই খাতা পত্তরও পায় ইস্কুল থেকে, সাহায্য ব'লে ; তাদের চেয়ে অনেক কম পাপ হচ্ছে আমার। হচ্ছে না ?

এর উত্তরে কী বলব, ভেবে পেলাম না ? সত্যিই কী এর উত্তর হয় ? যখন থেকে সুকমল এসব কথা বলছে তখন সুকমলের বয়স বারো পার হয়নি ; পড়ে থার্ড ক্লাসে।

কর্মজীবন আরম্ভ করেও সুকমলের বাড়ীতে গিয়ে দেখেছি সুকমল থাকে সব চেয়ে ভালো ঘরখানায়। যে ঘরটায় তখন সুকমল ছিল সেটা নতুন ; পরে তৈরী। বাড়ীর অন্যান্য অংশের ছাদটি আয়রণের ; শুধু সুকমলের ঘরের ছাদ ঢালাই করা। তখনও সুকমল কিছুই কাজ কর্ম করে না ; সুকমলের দাদারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে।

সেদিন ল্যান্সডাউন মার্কেটে দাশু চাটুজ্জেকে দেখে সুকমলের সরে যাওয়ার মুহূর্ত থেকে সুকমলকে নতুন চোখে দেখতে সুরু করেছিলাম। সুকমল হার্টলেস কিন্তু আর্টলেস নয়। দুঃস্থ বন্ধুবান্ধবদের ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি। অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছে। কোথাও যায় না ; গেলে বসে না। খেতে বললে খায় না। যেন কিছু করলেই সে খেলো হয়ে যাবে। নিজেকে ঘিরে এক রোমাঞ্চকর রহস্যের জাল বুনে চলল সুকমল। সে জালে ধরা পড়ল রুই কাৎলা থেকে চুনো পুটি সকলেই।

ঠিক সেই সময়েই নতুন আলোড়ন আনল সুকমল। সঙ্গীত জগতে। ফ্যাসনেবল সোসাইটির ড্রয়িংরুম ওয়ার্ল্ডে। এলা মুখার্জি, শীলা মুখার্জির পাল্লায় গিয়ে নাকি পড়েছে সুকমল দে। এলা আর শীলা, কলকাতায় তখন দুটি মাত্র নাম। আগুনের গোলা। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অনেক হৃদয়। টেনিসের উঠতি তারকা হাসু সেন, ভাসু সেন। ক্রিকেট খেলোয়াড় শরদিন্দু মুখার্জি। কটাক্ষেই ছাই হয়ে গেছে পতঙ্গ ; আগুনে পুড়বার পায়নি সুযোগ।

সুকমল ধরা পড়েছে সবে মাত্র। উল্লসিত হ'ল চেনা অচেনা সবাই। সুকমলের হাড় মাস কিছুই পড়ে থাকবে না আর। চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে কলকাতার গ্ল্যামার পল্লীর উত্তর আর দক্ষিণ পোল, সেই দু'টি মেয়ে; উর্বশী আর রম্ভা! এলা আর শীলা মুখার্জি।

যা রটে তার কিছুটা বটে, এই প্রবাদের ভরসায় অনেকেই স্থিরনিশ্চয় হল সুকমল সত্যিই ফেঁসে গেছে। বিয়েও হবে নাকি সুকমলের, ওদেরই একজনের সঙ্গে। কার সঙ্গে সেটা আন্দাজ করাই একমাত্র মুখোরোচক আলোচনার খোরাক হলো। মুখর হয়ে উঠল কলকাতা সেই স্পেকুলেশনে।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্বয়ং সুকমল এল আমার কাছে। একা। এসে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করল। সব শুনল চুপ করে, তারপর বলল : মাথা খারাপ আপনার? আমাকে চিনতে আর সবাই ভুল করতে পারে, কিন্তু আপনি, না দাদা, এলা-শীলার সঙ্গে সিনেমা দেখা যায়, জয়-রাইড করা যায়, প্রেম করা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না কিছুতেই, অন্ততঃ আমার পক্ষে তা অসম্ভব তবে—, বলে একটা লম্বা টান দিয়ে থামল সুকমল।

আবার, তবে কি! উৎসুক হলাম। তবে, আমি বিয়ে করছি; ওই বাড়িতেই করছি, কিন্তু এলা-শীলা কাউকেই নয়। ওদের অত্যন্ত দুঃস্থ এক বিধবা পিসীর মেয়েকে বিয়ে করছি সামনের মাসে। বুধবার পাকা দেখা। মেয়েটিকে আশীর্বাদ করতে যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করতে এসেছি আজ আপনাকে।

নড়ে-চড়ে বসলাম, বলে কি সুকমল। কিছুতেই চুপ করে থাকতে না পেরে বললাম : আমার হিসেব গুলিয়ে দিচ্ছ যে ভায়া? কেন? সুকমল নির্বিকার : বিয়ে করব না?

'নিশ্চয়ই করবে'; কিন্তু এলা-শীলার একজনের সঙ্গে হ'লে বুঝতাম ভুল হচ্ছেনা; বড়লোকের একমাত্র মেয়ে হ'লে মানে পেতাম; কিন্তু তুমি যে বলছ দুঃস্থ বিধবার মেয়ে—

হ্যাঁ, শুধু দুস্থ নয়, নাম শুনেই বুঝবেন, মেয়েটা গ্ল্যামার-গার্লও নয়, বিদুষীও নয়। মেয়েটির নাম তরুবালা—

'নাম না হয় তরুবালা হল, কিন্তু এ বিবাহের ব্যাপার তোমার চরিত্রের সঙ্গে মিলছে না যে ভায়া—'

'সবটা জানলে বুঝবেন, এ ব্যাপারেও ভুল করিনি,'—একটু যেন আলো দেয় সুকমল ; বলে, দু'টো কারণে এ বিয়ে করছি। এক, সবাই যখন এ-বিয়ের কথা জানবে, তখন আমাকে ধন্য ধন্য করবে, আর দ্বিতীয়তঃ মেয়েটা বিয়ের পর শাড়ী-গয়না চেয়ে বিরক্ত করবে না।

একটুখানি আলো পেয়েছিলাম ; নিভে গেল। আরও অন্ধকারে পড়লাম। বললাম সে কথা, বলতে একরকম বাধ্যই হলাম। বললাম, বুঝলাম না ত! লোকে কেনই বা ধন্য ধন্য করবে, আর মেয়েটাই বা শাড়ী-গয়না চাইবে না কেন?

সুকমল খোলসা করল না তখনও, শুধু বলল : যারা বাইরে থেকে এ-বিয়ে দেখবে, তারা আর আমাকে হার্টলেস বলবে না, কারণ এ-বিয়ের খরচা পত্তরও সব আমার।

'বুঝলাম, কিন্তু মেয়েটা শাড়ী-গয়না চাইবে না কেন?'

'চাইবার উপায় নেই বলে— !'

'কেন?'

'কারণ?'—একটু থামল সুকমল, বলল, বলছি ; আগে একটু জল আনান দেখি।'

পুরো এক গ্লাস, জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল সুকমল। নাটকীয় প্রস্থানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে চিরাচরিত মুদ্রাদোষটির আশ্রয় নিলো আরেকবার। চোখ দু'টোকে ছোট করে এনে প্রায় বুজিয়ে ফেলার মত করে বললে : সেইদিনই তরুবালার মা'কে কথা দিয়ে এলাম, তরুবালাকে বিয়ে করার পাকা কথা যেদিন—'

'যেদিন?'—চেঁচিয়ে উঠি আমি, 'যেদিন কী—'

'যেদিন প্রথম জানলাম, তরুবালা বোবা।'

আমেন

গোবিন্দলালের এ-যাত্রা আর রক্ষে নেই।

শেষ ভরসা ছিলো ট্রাম-ষ্ট্রাইক, তাও তেমন জুতের হল না। জমতে না জমতেই মিটে গেলো। এমন কি গোবিন্দ শেষ আধুলিটা দিয়ে দিয়েই বলেছিলো স্ট্রাইকওলাদের ঃ পূজোর ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত যদি দোকান-টোকান বন্ধ না রাখাতে পারো. কাপড়-চোপড়ের দোকানগুলো অন্তত, তাহলে জীবনে আর তোমাদের ঝুলিতে কিছু দিচ্ছি না—এই বার এই আধুলিটাই আমার শেষ দান (শেষ কথাটা বলতে গিয়ে গোবিন্দ যেন স্থুর করে লাইনটা গেয়েও দিলো)!

যারা স্ট্রাইক করতে বেরিয়েছিলো, তারা অবাক হয়ে শুনছিলো।

তবে যতই অবাক হোক, আধুলিটা নিতে তাদের ভুল হয় নি। এবং একবার আধুলিটা দেওয়া হয়ে গেলে তারা আর দোকান বিশেষ করে কাপড়ের দোকান কেন বন্ধ রাখাতে হবে, সে-নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবাটা সময়ের অপব্যয় মনে করে এগিয়ে পড়েছে ঃ

"ট্রামের ভাড়া বাড়ানো চলবে না! চলবে না!"

এই চলবে না কথাটা গোবিন্দর ভারি মনে ধরেছে। সত্যিই আর চলবে না। কী করে চলবে। মুদির দোকানে ধার পাওয়া যেত, এখন র‍্যাশান। তখন একটি বউ মাত্র ছিলো, এখন বউ প্লাস চারটি ছেলেমেয়ে। সম্বলের মধ্যে ফিল্ম কোম্পানীর একটি চাকরী। ফিল্ম কোম্পানীর আবার অদ্ভুত ব্যবস্থা। বছরে তিন বার মাইনে। বাকী ন'মাসের মধ্যে তিন মাসের মাইনে বাকী থাকে, এ-বছর থেকে ও-বছর brought forward হয়। বাকী ছ'মাস আজ দু' টাকা কাল চার টাকা করে (রবীন্দ্রনাথের সেই ঃ সে কি এলো, সে কি এলো না, বোঝা গেলো না), মানে মাইনেটা শেষ পর্যন্ত পুরো আদায় হয় কি না মনে থাকে না। এর ওপরেও আছে, শ্রীচৈতন্যের 'এহ বাহ্যে'র মত

তার আর শেষ নেই। স্টুডিওতে প্রায়ই গোবিন্দকে ম্যানেজ করতে হয়। গোবিন্দ একজন এ্যাসিষ্টেন্ট, তাই ম্যানেজ করাটাই তার সত্যিকারের একমাত্র কাজ। এই 'ম্যানেজ' করার ইতিহাস-ভূগোল দুই-ই আছে। স্টুডিওতে গোবিন্দর যিনি 'স্যর' অর্থাৎ প্রডিউসার, তার টাকা সব সময় এসে পৌঁছয় না। তার আবার কারণ আছে। প্রোডিউসার যেখান থেকে টাকাটা আনেন সেই ডিস্ট্রিবিউটর একা নন তার পার্টনার আছে। পার্টনার আর তাতে দেখা হয় না, কাজেই একটা সই কখন হয়ে যায়। শুধু আর একটা সই-এর অভাবে ডিস্ট্রিবিউটরকে বলতে হয়ঃ ভেরি সরি আজকের দিনটা চালিয়ে নিন, সোমবার first hour এ ডেফিনিট (এ-সব ক্ষেত্রে মাঝের দিনটা প্রায়ই রোববার পড়তে দেখা গেছে),—আর সোমবার ফার্স্ট আওয়ার মানে মঙ্গলবার লেট আওয়ার্সে বেস্পতিবারের একটি পোষ্ট ডেটেড চেক সেটি জমা দেবার আগে ডিস্ট্রিবিউটরকে একবার ফোন করে যেন জেনে নেওয়া হয় কারণ চেক বারবার ফেরৎ আসাটা প্রেস্টিজ নষ্ট করে। কাজেই প্রোড়িউসারকে ফিরে এসে বলতে হয়ঃ গোবিন্দ আজকের দিনটা ম্যানেজ করে নিতে হবে। অনেক সময় বলতেও হয় না। মুখ দেখেই গোবিন্দকে বুঝে নিতে হয়। গোবিন্দ তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকলে 'স্যর' রুষ্ট হন। একটা এত বড় আশুকর্তব্যর ভার অন্য কারুর ওপর না দিয়ে তার ওপর দেওয়া সত্বেও কেন গোবিন্দ নিজেকে এখনও কৃতার্থ বোধ করছে না প্রোডিউসারের চোখে সেই রক্তিম জিজ্ঞাসা। এবং গোবিন্দকে এগিয়ে পড়তে হয়।

পাঁচ টাকার এক্সট্রা-রোলের মেয়েকে আসছে ছবিতে নায়িকার রোল নির্ঘাৎ এই আশ্বাস-বাণীতে ভুলিয়ে, খাবার ওয়ালাকে এখনও হিসেব হয়নি বলে ধমকে, ড্রেস এবং সেটের টুকিটাকি সাপ্লায়ারকে 'কাল সকালেই যাচ্ছি-র প্রতিশ্রুতিতে নিরস্ত করে, আর কথা বলবার সময় দেয় না গোবিন্দ। কিন্তু শেষ নয়। ফিল্ম কোম্পানীতে এ্যাসিষ্টেন্টের চাকুরীর লাঞ্ছনা ছোট গল্পে খতম হওয়ার পাত্র নয়। আধুনিক বাংলা বই এর মত ওপরে ফাঁকা-নীচে ফাঁকা আঠারো লাইনে

এক পাতা, পরিচ্ছেদ সুরুতে আধ পাতা খালি শেষে, ঠুঁ পাতা শূন্যি, ছোট গল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেড়শো পাতার উপন্যাসও নয় এই লাঞ্ছনার ইতিহাস। এ একেবারে যাকে গিয়ে বলে থান ইঁট, সুবল মিত্রের অভিধান।

তাই এ-সবের পরেও ডিরেক্টরের দশ বছরের ছেলেকে রাতের বেলায় অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিতে হয়। এবং সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই ছাত্রের সোজা প্রশ্ন: তোমাদের রাতে আবার সুটিং আছে বুঝি?

গোবিন্দর অবাক-জিজ্ঞাসা: কই না?

হ্যাঁ আছে তুমি জানো না,' মাষ্টারকে ছাত্র সংশোধন করে, (বাবার এসিষ্টেন্ট মাস্টার হলে তাকে তুমি বলাই নিয়ম). : এই ত বাবা গাড়ী করে নন্দরানীকে নিয়ে চলে গেল। মাকে যাবার সময় বলে গেল: "সুটিং আছে ফিরতে দেরী হবে।"

অগত্যা গোবিন্দকে বলতেই হয়: হ্যাঁ-হ্যাঁ, একটু বাকী ছিলো কিনা, ও তুমি বড় হলে বুঝবে, ওকে বলে প্যাচ শট।

২

এ সব ভাবনা চুলোয় যাক, এখন সব চেয়ে বড় দুর্ভাবনা, সামনে পূজো। এই মুহূর্তে যাঁর ওপর গোবিন্দর সব চেয়ে রাগ হয়, তিনি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। কী দরকার ছিলো রামের অকালে মাকে জাগাবার। তিনি ত না হয় চোখ উপড়ে একরকম বেঁচে গেছেন। এখন এই পূজোর বাজার ত আর রামচন্দ্রকে করতে হয় নি। হার্ট উপড়ে ফেল্লেও এক পয়সা ধার দেবে না। ওদিকে বাড়ীতে দিনের পর দিন উপোষ করে কাটাও, দাঁতে কাঠি গোঁজ, তবুও পূজোর বাজার চাই। তুমি কিছু কিনতে না পারো, ছেলেমেয়েদের গায়ে অন্তত নোতুন জামা না উঠলে তোমার বউ কেঁদে কেটে একশা। পাড়ায় বেরুনো অসম্ভব। বুড়ো বাপ টিকে থাকলে তোমায় শুনতে হতোই যে তিনি পূজোর সময় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে উজাড় করে দিতেন।

উজাড় করে যে দিতেন এ কথা কে অস্বীকার করবে?—উজাড় করে না দিলে আজ তাঁর ছেলের এ-হাল হবে কেন?

৩

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো গোবিন্দ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখলো বউ খবরের কাগজ পড়ছে।

খবর কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বউ জিজ্ঞেস করলেঃ তাহলে এ-বছর পূজোর কাপড় কেনা হচ্ছে না?

'বোধ হয় না'—গোবিন্দর স্বর প্রায় সময়ই যা হয় বউ-এর সামনে, তেমন মিইয়ে পড়া নয় কিন্তু।

'আমি জানতাম'—গোবিন্দপ্রিয়া বল্লে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যে টাকা রেখেছিলাম সেগুলি তুমি যদি না নিতে ত পূজোর বাজার আমি চালিয়ে দিতাম। আজ বিয়ের পর দু বছরে তোমায় কত টাকা দিয়েছি জানো? নিজে ত ঝিয়ের অধম ছেঁড়া কাপড় পরে চালাচ্ছি—তার জন্যে তোমায় কিছু বলেছি কোনদিন ? কিন্তু ছেলেমেয়ে সারা বছর এই দিনটির মুখ চেয়ে বসে আছে তাদের কী বলব?

'—আ-হা-হা'—গোবিন্দ যতটা সম্ভব বাঘের মুখে পড়েও চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি বুঝবে না শুনবে না, শুধু শুধু চেঁচাবে—পূজোর কাপড় কেনা হবে না, টাকার অভাবে নয়, দোকানপাট বন্ধ থাকবে বলে।

কেন?—ছোট্ট প্রশ্ন ও-তরফের।

আর কেন?—ট্রাম ষ্ট্রাইক চলছে না?—তাদের লোকেরা নিজে আমায় বল্লে,—দোকান পাট সমস্ত বন্ধ করিয়ে দেব—

তাই নাকি?

তবে আর কী বলছি, এবারে একটু আগে থেকে, এখনই কাপড়-চোপড় গুলো কিনে রাখবো ভেবেছিলাম, দাম কম থাকতে থাকতেই। কিন্তু এই ষ্ট্রাইকেই তার দফা সারলো—একদমে কথাগুলো বলে গোবিন্দ তার স্ত্রীর মুখের দিকে লক্ষ্য করতে থাকে,—কিন্তু সেখানে বাংলা ফিলমের রাঙামূলো রোমান্টিক হিরোর মত কোন এক্সপ্রেসনই নেই।

কিন্তু ষ্ট্রাইক হচ্ছে ত ট্রামভাড়া কমানোর জন্যে,—তাতে কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকবে কেন ?

'সে কথা কে বলে ? ওকে বলে চাপ দেওয়া। কাপড়ের দোকান বন্ধ করো, লোকে বাধ্য হবে গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে ভাড়া কমিয়ে ট্রাম চালু রাখতে। তবে যতই করুক ষষ্ঠীর দিন গভর্ণনেণ্ট দোকান খোলাবেই—না হলে দেশে গোলমাল বেধে যাবে—এত বড় পূজো—সে ত আর কাপড়ের জন্যে আটকে থাকতে পারে না।

'তাহলে ষষ্ঠী পর্যন্ত কোন উপায় নেই—?

'তাই ত দেখছি'।

'নাও কাগজটা পড়ো, চা নিয়ে আসি'।

গোবিন্দ কাগজ খুলে ধরলো ! প্রথম খবর : কোলকাতা ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন প্রত্যাহার।

৪

এরপর আর খাটে বসে থাকা যায় না। ফুটপাথে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বার আগে শেষ চেষ্টা করে দেখবার মহৎ উদ্দেশ্যে গোবিন্দ তার পরের দিন ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ে স্যারের বাড়ীর দিকে। সূর্য উঠবার এবং কাক পক্ষী টের পাবার আগেই। কারণ কাকপক্ষী টের পাবার আগেই 'স্যর' কেমন করে না জানি টের পান যে পাওনাদার আসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্যারের মন পড়ে যায়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। ব্যস তারপর আর স্যারের পাত্তা সারাদিন কে পায় ! আজ দশ বছরের অভিজ্ঞতায় গোবিন্দ তার খাড়া-হয়ে-যাওয়া চুলে ভালো করেই জানে। 'স্যার' এর বাড়ী পৌছে শুনলে তিনি ঘুমোচ্ছেন। যাক ! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তবু বাড়ী আছেন। গোবিন্দও 'স্যারের' বাইরের ঘরের চেয়ারে একটু গা এলালো। এবং সেই তার কাল হল। ঘুম থেকে উঠে শুনলো স্যর বেরিয়ে গেছে। স্যরের ছেলে গোবিন্দ বল্লে, বাবা তাকে ঘুম থেকে তুলতে বারণ করেছিলেন, গোবিন্দ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এই জন্যে

গোবিন্দ যেন আপিসে দেখা করে। স্যর বুঝতে পেরেছেন গোবিন্দ কি জন্যে এসেছে।

বুঝতে যখন পেরেছেন, তখন গোবিন্দও মনে মনে ঠিক করে নিলো স্যার আর যেখানেই থাকুন আপিসে নেই! কাজেই বেলা তিনটে নাগাদ হাইকোর্ট পাড়ায় এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে স্যরকে গোবিন্দ ঠিকই পাকড়াও করলে। স্যরের একটা গুন হচ্ছে, গোবিন্দ বারবারই এটা লক্ষ্য করছে, স্যর কোন অবস্থাতেই কখনো কিছুতেই অপ্রতিভ হন না। তাই গোবিন্দকে দেখেই তাঁর সাদর অভ্যর্থনা : আফিসে বলে এসেছিলাম তুমি এলে এখানে পাঠিয়ে দিতে, বলে নি কিছু?

গোবিন্দ হ্যাঁ --না কিছুই বলে না, বসে পড়ে। 'নাও, খাও কিছু' —স্যর সদয় হন, গোবিন্দ খায় বটে, কিন্তু খেতে খেতে কুঁকড়ে যায়। এর পরের অধ্যায় তার মুখস্ত।

স্যর পান চিবোতে চিবোতে মুক-বধির মুদ্রায় জিজ্ঞেস করেন : কত হয়েছে। তিন টাকা বারো আনা।

গোবিন্দ, আমার কাছে এখন নেই—ওটা দিয়ে এসো।

রাস্তায় নেমে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কত দরকার?

'দেড়শো,—গোবিন্দের গলা দিয়ে কোনরকমে এইটুকু বেরোয়।

'কবে দরকার?'

আজই—না হলে আর বাড়ী ফিরতে পারবো না।

এসো—দেখি কতদূর করা যায়—স্যরের মুখে মাভৈঃ।

তারপর স্যর-এর পেছনে পেছনে সারাদিন। প্রথমে 'স্যর' বড় ট্যাক্সী করে বেরুলেন বেবী ট্যাক্সী ধরবার জন্যে। বেবী ট্যাক্সী যখন পাওয়া গেল তখন বড় ট্যাক্সীতে ভাড়া উঠেছে তিন টাকা কত যেন; গোবিন্দ বিমূঢ়। তার কাছে ত আর চার আনা মাত্তর সম্বল, স্যরের কাছেও ত কিছু নেই, এবার?—স্যর দিব্বি বেবী ট্যাক্সীতে বসে ড্রাইভারকে বল্লেন : বড় ট্যাক্সীওয়ালাকে তিন টাকা বারো আনা দিতে; বাড়ী গিয়ে স্যর দিয়ে দিবেন। তারপর সারাদিন এ-আপিস থেকে ও-আপিস। রাত এগারোটায় বাড়ী পৌঁছলেন যখন তখন সতের

টাকা চার আনা উঠেছে বেবীর ভাড়া। স্যর ওপরে উঠে গেলেন গোবিন্দকে নিয়ে। ওপরে গিয়ে বার করলেন একটা থলি। দেখে গোবিন্দর ধড়ে প্রাণ এলো। থলিটা খুলতেই প্রাণ আবার উড়ে গেল, ধড়টা আগের মতই ছটফট করতে লাগলো। থলিতে শুধু পয়সা এক পয়সা। স্যার বলেনঃ গোবিন্দ ওর থেকে গুণে একুশটা টাকা ট্যাক্সীকে দিয়ে এসো। গুণে শেষ করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। নীচে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখে মিটারে তখন ভাড়া আরো উঠে গেছেঃ এবং তখন আবার ওপরে এসে—

অতঃপর স্যর একটা দেড়শো টাকার চেক লিখে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বল্লেনঃ এটা জমা দিও না।

তবে ?—গোবিন্দর অন্তিম জিজ্ঞাসা।

এটা তোমার কাছে রাখো—পঞ্চমীর দিন সকালে আমার কাছে এসো, টাকা এখান থেকেই পাবে—ওটা ফেরৎ দিয়ে দিও তখন।

গোবিন্দ রাত একটায় বাড়ী পৌঁছে স্ত্রীকে জানালেঃ টাকা পেয়েছে।

গোবিন্দ চেক ভাঙ্গাতে শেষ পর্যন্ত চেষ্টাও করল না। স্যরের কাছেও গেল না। তার কিংকর্তব্য সে ঠিক করে নিয়েছে। তার মুখে এখন বুদ্ধের পরম প্রশান্তি। গোবিন্দর বউ ঘাবড়ে গেছে। গোবিন্দর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি ত ?—নাঃ! দূর! সে কি ভাবছে ? গোবিন্দর মাথা ত খারাপই ছিল বরাবর। মাথা তাহলে ঠিক হয়ে যায়নি ত হঠাৎ ? মুখ দেখে মনে হয় যেন ব্যাঙ্কে কি সিন্ধুকেও নয়, টাকাটা ট্যাঁকেই গোঁজা আছে, বল্লেই বার করে। অথচ এ-কয়দিনের বাজারও কাগজ বেচে, শিশিবোতল বেচে, ধার করে বাকী রেখে চালাতে হচ্ছে। তবুও গোবিন্দর মুখে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, নেই কোন ভয়ের আভাস, এমন কি এতটুকু তাড়াহুড়ো, ছুটোছুটি কোন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না টাকা জোগাড়ের। তাহলে ?

পঞ্চমীর দিন বিকেল বেলায় গোবিন্দ বেরুলো বউ ছেলে মেয়ে সমেত। রাস্তায়ও গোবিন্দর সেই একভাব।

গোবিন্দর বউ আর থাকতে পারলো না।

কী গো কোথায় যাচ্ছ? বাজার ত এদিকে নয়! মাথা খারাপ হয়েছে?

'না', গোবিন্দর ছোট্ট জবাব : ঠিক আছে, এসো।

সামনে চার্চের ছোট গেট।

এবং সটান একদম ভেতরে। যেখানে পাদরী বাবা চোখ বুঁজে বসেই টের পাচ্ছেন।

তাহলে যীশু তোমাদের প্রেম করেছেন?

না।

তবে?—খৃষ্ট ধর্মে গৃহীত হতে আস নাই?

হ্যাঁ।

তবে কেন বলছ যীশু প্রেম না করছেন?

যীশুর প্রেমে নয় পূজোর বাজারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। হিন্দুদের পূজো না করলে চলে, কিন্তু পূজোর বাজার না করলে কেউ বাঁচতে দেবে না—

তারপর গোবিন্দ বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—তবে এই ধর্মান্তর টেম্পোরারী মাত্র, ডিসেম্বরে আবার যীশুকে ভালোবাসার জ্বালাও কম নয়, তখন বড়দিনের বাজার—এবং তখন আবার কেঁচে গণ্ডুষ!—তখন আবার হিন্দু হওয়া!

—কিন্তু ওকি!—গোবিন্দ বলতে বলতেই দেখে, পাদরী বাবা, ঢলে পড়ছেন চেয়ারে, আর খাড়া:নেই! কী যেন বলছেন!—কান পেতে শুনলো গোবিন্দলাল।

শুনলো তিনি বলছেন :

আমেন! আমেন! আমেন!

সেই বুঝি তাঁর শেষ কথা!

॥ দুটি রাত্রি ॥

গান

হরিশ মুখার্জি রোডের এ মেসটা মন্দ নয়। ছটো তিনটে স্নান ঘর আছে। সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা হল ঃ তাই। স্নানের জলের খামতি নেই, অসুবিধে নেই দিনে ছবার স্নানের। মেস নয় ঠিক, অপিসের কয়েক বাবু মিলে করেছেন, একটা ফাঁকা সীটে তাঁরা বাইরে থেকে একজন নিতে খুব গরজ না দেখালেও আপত্তি করলেন না। প্রথমটা ঘাবড়ে ছিলেন আমি লিখি শুনে। তারপর খুব খুশী হলেন ডিটেকটিভ গল্প লিখি শুনে। বল্লেন, দেবেন ত স্যর একখানা বইতে নাম লিখে উপহার দিয়েছেন যেন, দাম দেব আমি, তবে রণদা চক্রবর্ত্তী তাঁর লেখা একখানা বই দিয়েছেন শুনলে বউ-এর কাছে প্রেষ্টিজ বেড়ে যাবে। আমি বল্লাম, দেব এক সর্তে, দাম না নিয়েই দেবো, তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে আপনাকে ম্যানেজারবাবু।

বলুন, বলুন ম্যানেজারের পক্ষে যতটা হাসি মুখে আনা সমীচীন, তার চেয়ে যেন একটু বেশী খরচ হয়ে গেছে বলে, যতটা হেসেছিলেন ঠিক ততটাই গম্ভীর হয়ে বল্লেন, পসিবল্ হলে নিশ্চয় কোরব—

ইম্পসবিল কিছু করতে আমিই বা আপনাকে কেন বলব? শুধু কেউ যদি এসে জানতে চায় রনদা চক্রবর্ত্তী এখানে থাকেন কিনা, বেশ কড়া ভাবেই 'না' বলে দরজা দেখিয়ে দেবেন।

'কেন বলুন তো' সন্দেহকে যদি শানিত তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা চলত ত বলতুম ম্যানেজারবাবু রীতিমত সন্দেহ করলেন আমাকে খুন করে এসেছি কিনা কাউকে এবং তলোয়ার উঁচিয়ে সন্দেহ নিরসনের জন্যে যেন এগিয়ে এলেন বলে মনে হোল।

"না না কোন মন্দ কাজ করে এসেছি বলে নয়, প্রকাশকদের জানা ঠিকানার বাড়ীটা ছেড়ে উঠে এলাম ত শুধু বিশ্রামের জন্যেই।

আঠারোখানা বই-এর কন্ট্রাক্ট ছিলো—এখন কিছুদিন আর লিখতে মন লাগছেনা—তাই বলছিলাম—

বুঝেছি বুঝেছি ম্যানেজারবাবুর মুখ আবার গোল পউরুটির মত মোলায়েম হয়ে এলো। এই দেখুন কত লোক একটা লেখা ছাপাবার জন্যে হা পিত্যেশ করে দোরে দোরে ঘুড়ে বেড়ায় আর আপনি টাকা পাবেন যে লেখার বিনিময়ে তাও লিখতে রাজী নন। ম্যানেজারবাবুর মুখে গাম্ভীর্যের গ্রহণ কেটে গিয়ে এবার পূর্ণিমা রাতের হাসি দিলো।—আঠারোখানা বই—কত টাকা পেলেন স্যর?

'টাকা' সে শুনে আর কাজ কি? বলবার মত নয়, মদ খাইনে মেয়েমানুষের দোষ যাকে বলে তা নেই। স্ত্রীপুত্র পরিবার কেউ নেই, তাতেও পেট চালাবার জন্যে আঠারোখানা বই লিখ্‌তে হয়েছে আমাকে নিছক গ্রাসাচ্ছদনের জন্যে।

পোড়া দেশে তবু আর কিছু না করে যে শুধু লিখে চালিয়ে দিলেন এটাই কি কম কথা—রনদাবাবু? হাঁ ভালো কথা। কথায় কথায় ভুলে যাবো—আপনার আগামটা।

আগাম দিয়ে নিজের ঘরে এসে যখন তক্তপোষে লম্বা হ'লাম তখন দেওয়ালের ঐ টিকটিকিটা যে একটা ফড়িং ধরে খাচ্ছিল সে ছাড়া আর কেউ নেই। টিকটিকির ডিনারের সঙ্গে শুধু একটা টাইম পিসের টিকটিক ধ্বনি বোধ হয় মিউজিকের অতিরিক্ত আনন্দটুকু জুগিয়ে চলেছিলো।

এসেছিলাম সত্যি করেই অজ্ঞাতবাসের জন্যে। উত্তরপাড়ার লোক আমি দক্ষিণপাড়ায় এসেছি একটুখানি মুক্তির জন্যে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে। বহু লোকেই আমার ভাগ্যকে ঈর্ষ্যা করে আমি ছাড়া। আমার ওপর নির্ভর করে এমন কেউ নেই আমার। চল্লিশ টাকার কেরানী হয়েও আমার জীবন কেটে যেতে পারতো। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনলো আমার জীবনে পবনকুমার। পবনকুমার আমার গল্পের নায়ক। অজেয় অমর। তাকে প্রত্যেকবার মৃত্যুর গহ্বর থেকে বাঁচিয়ে এনে নবজীবন দান করছে কে?—আমি। প্রত্যেক

বার তার মুখুজ্যেমীর জন্যে শত্রুর জয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখনও এক খোচায় জয়কে পরাজয়ে মোড় ঘুরিয়ে লক্ষপতির কন্যাকে পবনকুমারের হাতে তুলে দিয়েছে কে ?—আমি। মাথায় হাতুড়ী মেরেও দুর্ধর্ষ দস্যু যে তার প্রাণ বার করতে পারেনি সে কার দয়ায়—আমার। কে তাকে বাঁচাবার জন্যে ঠিক সময়ে তার সহকারীকে এনে হাজির করে দেয় প্রত্যেকবার—কে সে ? আমি। তবু পবনকুমার আমায় স্বস্তিতে থাকতে দেয় না এক মূহূর্ত্ত। ঘুমিয়ে জেগে সেই এক মানসিক বিভীষিকা—পবনকুমারকে এবার কোথায় নিয়ে যাব বাটাভিয়ায় না ব্লাডিভস্টকে। কোন সিচুয়েসানে তাকে ফেলে আবার বাঁচাব। কি করলে পাঠক আমার বাঁধা ফর্মূলাকে ধরতে পারবে না। পবনকুমার অকৃতজ্ঞ। সে তার স্রষ্টাকে বিপদে ফেলে আনন্দ পায়। পবনকুমার শুধু বুদ্ধিহীন নয় বিবেচনাহীন। বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন ধরা পড়লে সব দায়িত্ব শুধু আমারই। গত নমাসে আঠারোখানা পবন-কুমার লিখেছি আর নয়। আমাকে পাঁচ এডিশনের টাকা একসঙ্গে দিলেও নয়। পবনকুমার কে এখন আমি তাও জানি না। জানতে চাই না। চিনি না, চিনতে চাই না।

মেসের খাওয়াটা খুব খারাপ নয়। ঝোলের বাটিতে ডুবুরী নামালে মাছ হয়তো এক টুকরো পাওয়া যায়। নুনের ঘাঁটতি কিন্তু হলুদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রান্নায় উপস্থিত। আর চালে কাঁকর থাকলেও চালের কোয়ালিটি যাতে অখাদ্যের চেয়ে উপরে না যায় সেই ঐক্য সাবধানে বজায় রেখে চলেছেন ম্যানেজারবাবু। তাই চালের সঙ্গে কাঁকরও খাচ্ছি ভেবে দুঃখ পাওয়ার নেই কিছুই। পুরোটাই কাঁকর দেওয়ার বৈশিষ্ট্যে —ম্যানেজারবাবুর স্বাতন্ত্র্যও বজায় আছে। তবুও গায়ে মাখলাম না। আমার নায়ক যদি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সামান্য কাঁকর হজম করতে পারব না আমি। পারব। পারলামও।

শুধু সহ্য করতে পারলাম না কালীবাবুকে। সন্ধ্যে বেলায় অফিস থেকে তিনি না ফেরা পর্য্যন্ত ধারনাই করতে পারিনি যে সব সুখ সত্যিই মানুষের কপালে নেই। ভদ্রলোক বদ্ধ উন্মাদ। সত্যি উন্মাদ। গান

পাগলা লোক কালীবাবু। তাঁর গলা দিয়ে যে কোনও দিন সুর বেরোবে না আমার হাত দিয়ে পবনকুমারের মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হলেও আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। সত্যিই। প্রথম দিন তিনি যখন গলা দিয়ে আওয়াজ বার করলেন আমার ঠিক মনে হয়েছিল বুঝি কাবুলীওয়ালা গান গাইছে। অমন বীভৎস, অমানুষিক আর্ত্তনাদ ক্লোরফর্ম বেরুবার আগেও হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে কেউ শোনেনি। সারগাম করছেন কালীবাবু। চোখ বুজে তানপুরা বাগিয়ে সুরের ঝর্ণাধারা ছোটাচ্ছেন তিনি। মানুষ জন্তু কীটপতঙ্গই যে শুধু বিস্মৃত হয়েছেন কালীবাবু তাই নয়। তাঁর চেতনা থেকে যেন পৃথিবীও বিলুপ্ত। সুরের সমাধি শুনেছি কিন্তু অসুরের যে সমাধি হয়, হতে পারে সেদিনই যেন প্রথম অনুভাবনায় এলো।

রাত্তির যত বাড়ে অসুরের সুরচর্চা তত সীমা ছাড়ায় সারা। বাড়ীটায় কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই উন্মত্ত স্বরতাণ্ডব চলছে আমার কানে একটানা। সুর নেই, তাল নেই, লয় নেই। গান শুনলেও যে খুন করবার ইচ্ছে চাগতে পারে এ অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। কিন্তু সেই শেষ নয়। পরের দিন, তারপরের দিন তারও পরের দিন এবং আবার তারও পরের দিন। সেই অশান্ত গর্জন, সেই অবিশ্বাস্য বেসুরো গলায় সুরসাধনা। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কষ্ট আমার কষ্টের কাছে কিছুই ছিলো না নিশ্চয়ই। চতুর্থ না পঞ্চম দিনে ম্যানেজারকে বল্লাম, কালীপদবাবুর কথা আমায় বলেননি কেন ?

কালীবাবুর কথা, কেন তিনি আপনায় চিনতে পেরেছেন না কি ? তা এক আধজন তো পারবেই—আপনি খ্যাত—

মুখের কথা মুখেই রইলো আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। রাখুন মশাই চেনার কথা, অচেনাতেই কানে তালা লাগিয়ে দিলে, চেনা হলে ত প্রাণে ঘা দিত। না মশাই এর চেয়ে প্রকাশকের পাল্লায় ছিলাম ভালো। এ-জঞ্জাল বিদায় করুণ না হয় আমিই বিদায় হই।

ছি ছি কি বলছেন ও-ভদ্রলোকের জীবনে আছে কি গান ছাড়া। মদ নেই, স্ত্রী নেই, অন্য মেয়েছেলে নেই শুধু নির্দোষ একটু গান।

নির্দোষ কিন্তু দোষের কোন নেশা থাকলে হয়ত উনি একাই মরতেন। এ নির্দোশ আনন্দ যে আমাদেরো সঙ্গে সঙ্গে মারবে।

কেন ? ও-সময় ত সকলেই বাইরে থাকে—আপনিও না হয় ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসবেন ?

বাড়ী থেকে পালাবার জন্যে যদি বেরুতে হয়ত বাড়ীর বাইরে থাকাই ভালো, বাড়ী কেন তবে ?—আর এসেছিই ত সারাদিনরাত ঘরে বসে অজ্ঞাতবাস করতে।

কিন্তু ওটুকু মাপ করতেই হবে।

মাপ করতাম যদি গলা দিয়ে এক আউন্স সুরও বেরুতো।

বলে রেগে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সন্ধ্যে বেলায় বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। বেরিয়ে পড়েই মাথায় এলো পবনকুমার। কালী-বাবুর গানের গুতোয় পবনকুমারকে ভুলে ছিলাম। এখন আবার আর এক যন্ত্রনা। ঘরে বাইরে দিনের পর দিন ব্যাডমিণ্টন বলের মত দুই দুর্ভাবনার র‍্যাকেটে পিষে মরা ছাড়া যখন উপায় দেখলাম না আর তখন কালীবাবুকে একদিন সোজাসুজি বলব বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু এখন ভাবি কেন বললাম। উধোম পাগল লোকটা। বলে সুরের তপস্যা করছি, দেবী প্রসন্ন হয়ে একদিন নাকি তাঁকে বর দেবেন। তারপর যখন জানালাম তাঁকে যে সঙ্গীতচর্চা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম হচ্ছে মাত্র, শুনে অত বয়সী লোক একটা, বলব কি হাউমাউ করে কেঁদে ফেল্লে। তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম সাতবছর ছঘণ্টা করে রেওয়াজ করেছেন কিন্তু তাঁর গান শুরু করা মাত্র লোক পালিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তেরোটা মেস তাঁকে শুধু গান গাইবার অপরাধে ছাড়তে হয়েছে। বুঝলাম সব, এবং বললাম না আর কিছুই। কালীবাবু নিজের কানেই সব শুনতে পান এবং নিজের চোখেই দেখতে পান যা দেখবার। কিছুই তাঁর অজানা নেই যে তাঁর গান শুনলে লোকে পাগল হয়ে পালিয়ে যেতে চায়। যদিও যক্ষ্মারোগের মত সংক্রামক নয় কিন্তু মারাত্মক আরো বেশী। আধুনিক চিকিৎসায় যক্ষ্মা আর অনারোগ্য নয় দুরারোগ্য মাত্র। কিন্তু এ-গানের পাগলামি কালীবাবুকে খেয়ে এমন জয়গায় তাকে এখন

নিয়ে গেছে যা সমস্ত চিকিৎসার বাইরে। কোন চিকিৎসকের করবার এতটুকু কিছুই নেই।

মেস ছাড়লাম না কিন্তু পুরী পালিয়ে এলাম। না এসে উপায় ছিলো না। কয়েকদিন সন্ধ্যে বেলায় পরপর কালীবাবুর গোঙ্গানী শুনবার পর তাঁর গানের ভূত আমাকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুল্লে। যখন তিনি সত্যি সত্যি গান গাইছেন না তখনও মনে হচ্ছিল তিনি গান গাইছেন। সন্ধ্যে আসবার অনেক আগে থেকেই আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে যেত। এই বুঝি গান সুরু হয়। পুরীতে এসে প্রথম সন্ধ্যেবেলায় ভারি একটা খুসি লাগল মনে। কালীবাবুর গান নেই। একটা বই নিয়ে বসলাম হোটেলের বারান্দায়। কিন্তু বেশীক্ষণ মন বসাতে পারলাম না বইতে। বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের দিকে। দীর্ঘ-কাল জ্বরের পর জ্বর ছেড়ে গেলে কিরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যেন শরীর থেকে ভার কমে গিয়ে বড্ড হালকা লাগে অথচ সে লঘুত্ব ভারি অস্বস্তিকর। যেন অন্ধ হঠাৎ আবার চোখ ফিরে পেয়েছে। যে আলো তার কাম্য ছিলো সেই আলোকেই সে যেন সহ্য করতে অক্ষম। না। অস্বস্তির ভাবটা ক্রমশ আমাকে পেয়ে বসল। কালীবাবুর গানই যেন ভালো ছিল। কালীবাবুবিহীন হোটেল মনে হতে লাগল *যেন বিপত্নীকের খাটের মত। স্ত্রী থাকতে যে জ্বলেছে অথচ স্ত্রী আজ* নেই:বলে শয্যায় শুয়ে থাকতে যার কেবলি মনে হচ্ছে আজ সে পাশে থাকলেই ভালো ছিলো।

দুদিন কি তিনদিন। না কালীবাবুর গান আমায় যেমন পাগল করেছিলো কালীবাবুর গান না গাওয়াও আমাকে পাগল করলে দেখছি পুরী থেকে আবার ফিরে এলাম সেই মেসে। যখন মেসে পৌঁছলাম তখন সবাই কাজে চলে গেছে ম্যানেজার বাবুও নেই। ওপরে এসে কালীবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে নিজের ঘরে আসতে দেখি তাঁর ঘর চুন-কাম করা হচ্ছে। একটু অবাক হলাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম, কালীবাবুর ঘর চুনকাম হচ্ছে কেন রে ?

চাকরটা বললে। কালীবাবু মারা গেছেন বাবু—তাই।

নিজের হৃৎপিণ্ডও বন্ধ হয়ে গেছে মনে হোলো! মারা গেছেন?'

আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি যেদিন গেলেন সেই দিন রাত্তিরে শুলেন খেয়ে দেয়ে—সকালে আর উঠলেন না।

সন্ধ্যে বেলায় ম্যানেজারবাবু বললেনঃ যা চেয়েছিলেন তাই হোলো আর কালীবাবুর গান নেই—এবার আপনি নিশ্চিন্ত। তখন ইচ্ছে হোলো ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই তার গালে। কিন্তু কেন যে এমন ইচ্ছে হোল কে জানে?

বোরখা

সবিতাকে এই গল্পটা বলছিলাম।

গল্পটা আমার শোনা একজনের কাছে। বিশ্বাস করিনি, কারণ প্রেমের গল্প; জানিনা গল্পটা সে কোথাও পড়েছিল না তার নিজেরই থেকেই বানানো।

সবিতাদির স্বামী ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার।

চাঁইবাসায় গিয়েছিলাম পূজোর সময়। তার আগের দিন সবিতাদির স্বামী নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। শিকার করতে নয় বেড়াতে। গাড়ীতে বটে, কিন্তু জঙ্গলে চলাফেরার অভ্যাস না থাকায় জঙ্গল থেকে ফিরে আসবার পর একটি সম্পুর্ণ সকাল আর সন্ধ্যে ঘরের মধ্যে আমায় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলে। সন্ধ্যেবেলায় গ্যাসবাতি জ্বেলে সবিতাদি আমাকে জিজ্ঞেস কোরলে' আচ্ছা, সরোজ তুমি যে গল্প লেখ, তার কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা থেকে আর কতটুকু তোমার বানানো।

'যদি বলি, পুরোটাই "বানানো"

"তাহলে পুরোটাই বিশ্বাস করবো। "তোমরা যারা সবে গল্প লিখতে সুরু করেছ," সবিতাদি বল্লে, "তারা ভাব' লেখায় স্টাইলটাই সব।"

"কেমন করে জানলে, আমার মনের কথাটা?"

"যাদের নিয়ে তোমরা হৈ-চৈ-কর তাদের লেখা পড়ে; বুদ্ধদেব বসু ছিলো তোমার কাছে দেবতা' এই কতদিন আগে বলব, এই পাঁচ বছর আগেও। কিন্তু বুদ্ধদেব কি ছিলো? ছুটো অদ্ভুত মতামত, গল্পের নাম করে চটুল উচ্ছ্বাস, আর কি? বুদ্ধদেব কি টিকলো?"

"তোমার মতে কে টিকবে শুনি!"—আমার সাগ্রহ প্রশ্ন।

"কেন, তারাশঙ্কর! তাঁর গল্পে, তোমরা যাকে স্টাইল বলো তা নেই, কিন্তু জীবন আছে। জীবনকে তিনি দেখছেন এবং পাঠকদের কাছে মেলে ধরেছেন। তাই কোনও মেকী ভাষার জৌলষে তাঁকে পাঠক মন ভোলাতে হয় নি। বাংলা সাহিত্যের অনেক রথীই তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির পাতালে, কিন্তু আমি তোমায় বলছি সরোজ, তখনও টিকে থাকবে, কালিন্দী আর কবির তারাশঙ্কর, রসকলী আর জলসা ঘরের, তুই পুরুষ আর হাঁসুলী বাঁকের উপকথার'। শুনে নাক সিঁটকিও না। এতবড় ক্যানভাসে গল্প, বল্লে রাগ করবে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং অপরাজেয় শরৎচন্দ্র, আমায় মাপ কোর একথা বলবার জন্যে হ্যাঁ এঁরা তুজনও তারাশঙ্করের মত এত বড় ব্যাপারে হাত দেন নি। রামায়ণ মহাভারতের পর আমাদের সমগ্র জীবন আর তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে এমন করে আর কে আমাদের পরিবেশন করেছে বলো!— সবিতা হাঁফাতে লাগল।

তারাশঙ্করের নাম শুনেই বিরক্তি এসে গেল। বল্লাম, আজকের সন্ধ্যেটা এমন কিছু নয়, তবুও একটা গোটা সন্ধ্যে, সত্যি বলছি, সবিতাদি বয়স হলেও তোমার চেহারা আমি এখন যাকে ভালবাসি তার চেয়ে এখনও অনেক সুন্দর কিন্তু তবুও বলছি সবিতাদি একটা গোটা সন্ধ্যে বুদ্ধদেব কি ফাঁকি দিলো আর তারাশঙ্কর কত ওভারড্রাফট কাটলো বিজ্ঞাপনসর্বস্ব বাংলা সাহিত্যের ব্যাঙ্কে, এ হিসেব করতে আমি রাজি নই। তার চেয়ে তোমায় আমি সম্পূর্ণ একটি বানানো গল্প বলছি। শুনে তোমায় বলতে হবে কিন্তু যে এ-গল্প আগে থেকে যদি বলে না দিতাম বানানো তাহলে তুমিও এতে জীবন সত্যিই খুঁজে পেতে কি না। গল্পটা বলবার আগে তোমার আজকের সন্ধ্যের প্রথম প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে নিই গল্প মাত্রই বানানো, অভিজ্ঞতা থেকে বলতে হয় এইজন্যে যে আমাদের মনটা অনেকটা অসুস্থ মাড়োয়াড়ীদের মত যে বিশ্বাসই করতে পারে না যে চৌষট্টি টাকার কম দামে, কোন ওষুধ খেলে কোনও উপকার হবে। কম্পাউণ্ডার বোকা, সে তু আনার বড়ি

বের করে দেয়—কিন্তু কবিরাজ চেনে তার রোগীকে, সে বলে, ক্ষেপেছ শেঠ, ও সাধারণ লোকের ওষুধ দেয়—ওকি জানে তোমার কি অসুখ' —আমি জানি। চলো চলো ওপরে আছে সিন্ধুকের মধ্যে চৌষট্টি টাকার পুরিয়া। এই 'ভড়িটুকুর' দরকার জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন সাফল্য আনতে। কাঁচা লেখকের লেখায় এই ভড়ি থাকে না। পাকা লেখকের রচনায় এই ভড়িকেই তোমরা গম্ভীর করে বলো জীবনদর্শন।

সবিতাদি হঠাৎ ভেতরে উঠে গেলো।

ফিরে এলো হাতে একটা কাপ নিয়ে।

আমার হাতে দিয়ে বল্লে, খেয়ে ফেলো, পাঁচন। কদিন অনিয়ম করেছ, শরীরটা ঠিক রাখবে, হ্যাঁ তার পর তোমার গল্প বলো।

কালো, বেঁটে, নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো, আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল, মাথার সামনের দিক কেশ বিরল, দাঁত পানের ছোপ ধরা এই হলো ভূতনাথবাবু। ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী, উল্টাডাঙ্গা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার। যখনকার কথা বলছি, তখনও তার বিয়ে হয় নি। কিন্তু বয়স ৩২ পেরিয়েছে, এখন বোধ হয় ছ'সাতটি হবে ছেলে মেয়ে নিয়ে। ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছেন, রাঁচিতে পাঠান হয়েছিল দু'বছর আগে, তারা বলেছে সারবে না। পাগল কেন হয়ে গেলেন, সে এক মজার গল্প।

একটি মেয়ে, তার নাম আমাকে যে এ গল্পটি বলেছে, সে গোপন করে গেছে কেন জানিনে। যাই হোক, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এ গল্পে আমি তাকে সুমিতা বলেই অভিহিত করব।

বছর বারো আগে সুমিতা বলে একটি কলেজের ছাত্রীকে তিনি পড়াতেন। এই ভূতনাথবাবু ছাড়া সতেরো বছর বয়সের আগেই তাদের বাড়ীতে এমন কেউ আসতো না, যে একবার না একবার তার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে। এমনকি তার মাসতুতো পিসতুতো ভাইরাও তার সঙ্গে মিশবার লোভে সব সময় স্মরণ রাখতে পারতো না যে সুমিতা আর তাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য আত্মীয়তার একটা প্রাচীর আছে।

ব্যাতিক্রম ছিলেন শুধু ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী।

অবশ্য তাঁর সেদিকে কোনও লক্ষ্যই ছিলো না। তার নিজের চেহারা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয় সচেতন ছিলেন। কারণ অন্যত্র ত বটেই, সুমিতাদের বাড়ীতে তাঁর চেহারা, কথাবার্ত্তা সব কিছুই হাসির উদ্রেক করত। তাঁর এই চেহারার সঙ্গে কে আবার জুড়ে দিয়েছিল, যে ভূতনাথবাবু নাকি বদ্ধ কালাও। ফলে, দরজা দিয়ে তিনি ঢুকছেনঃ সুমিতার পরের ভাই বেশ উঁচু করেই বলেঃ এই রে সুমিদি কোথায়? 'অমৃতসালসা খাওয়ার পরে' ঢুকছে। ভূতনাথবাবু সত্যিই কানে কম শুনতেন না। কালা হলেও এসে যেত না। তিনি এদের হাবভাব দেখেও বুঝতেন সব। তবে কোনও ভাবান্তর তাঁর মুখে কোনও দিন কেউ দেখেনি। বোধ হয় এ তার গা সওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

কৌতুক করতে করতে এক একদিন বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটে যেত। যেমন অনেক দিনের মধ্যে একটি ঘটনা একদিন এইরকম হল। সুমিতা কোথায় যেন গিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে। ভূতনাথবাবু সন্ধ্যের সময় পড়াতে এলেন, তখনও সুমিতা বাড়ী ফেরে নি। বাইরের বড় ঘরে, সুমিতার দাদা তাদের বন্ধু বান্ধবেরা আড্ডা দিচ্ছিলো। ভূতনাথবাবু ঢুকতেই তারা "এসো এসো মাষ্টার," বলে চেয়ায় এগিয়ে দিলে। মনে হল তারা যেন ওৎ পেতে ছিলো কি যেন ভূতনাথবাবু বলি বলি করেও না বলে, একধারে চুপ করে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। দেখো মাষ্টার চেয়ার থেকে পড়ে না যাও, তুমি এই ইজি-চেয়ারে বসো। ভূতনাথবাবু সুমিতার বড় দাদার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় কিন্তু মাষ্টার বলায় তিনি রাগ করেন না একটুও। সুমিতার দাদারা যে তাকে আপন জন ভেবেই মাষ্টার বলে এ-যেন তিনি বিশ্বাস করেন আর বিশ্বাস করবার কথাও, সুমিতার দাদার সবাইকে 'তুমি' বলা অভ্যাস হলে ত ড্রাইভারকেও বলতেন। কিন্তু ভূতনাথবাবু স্পষ্ট শুনেছেন কুড়ি বছরের জীবন ড্রাইভারকে, জীবনবাবু বলে ডাকতে।

মাষ্টার একটা কথা জিজ্ঞাস করব?

ভূতনাথবাবু, আবার কি বলতে গিয়ে থেমে যান। তারপর বলেন ঃ স্নুমিতার আসতে কি দেরী হবে ?

না, মাষ্টার, না। তুমি বোস না। তুমি কেবলই আমাদের এড়াতে চাও কেন মাষ্টার। আমরা তোমাকে নিয়ে একটু মজা করি। কিন্তু সত্যিই কি তোমায় পর ভাবি, বল তুমি একবার। থাক। হ্যাঁ, মাষ্টার তুমি বিয়ে করনি কেন ? ওধার থেকে স্নুমিতার ছোট ভাই বলে ঃ কেন আপনি এখনও বিয়ে করেন নি স্যার।

'আপনার এমন স্বাস্থ্য'—একজন কোনধার থেকে বলে যেন। চাপা নয় সজোর হাসির সশব্দ ঢেউ শোনা যায়। হ্যাঁ ভূতনাথবাবু সম্বন্ধে একটা কথা তোমায় বলিনি সবিতাদি—

এতক্ষণ আমি সবিতাদিকে ভাল করে লক্ষ করলাম। ফল ধরেছে বানানো গল্পেই-সবিতাদির হয়ে গেছে। আমি একটু হাসলাম !

হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় ভূতনাথবাবু সম্বন্ধে বলিনি সবিতাদি।

ভূতনাথ বাবুর থলথলে শীরর কল্পনা করা শক্ত। মুখ বাদ দিয়ে বুক আর পেট থেকে তাকে মেয়েছেলে বলেও ভুল হতে পারত।

ভূতনাথবাবু কথা বা হাসি কিছুতেই চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বল্লেন ঃ বড় সংসার রোজগার কম, তার উপর আবার আমি বিয়ে করলে...

কিন্তু এ তোমার অন্যায় মাষ্টার তোমার মত লোক যদি কন্যাদায় উদ্ধার না করে ত দেশের মেয়েরা যাবে কোথায় ? তোমার মত স্বামী পাওয়ার ভাগ্য কজন আর করেছে, এ প্রশ্ন তুমি অবশ্য তুলতে পার। কিন্তু না হয় নিতে কোনও মেয়েকে ক্ষমা ঘেন্না করে—।

হাসিতে ঘরের ছাদ ফেটে পড়বার উপক্রম হতেই স্নুমিতার দিদি ঘরে ঢোকেন। ভূতনাথবাবুকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় তিনিও যোগ দেন। কিন্তু মাত্রা ছাড়ালে ধমকান, আজও বল্লেন, কি কচ্ছিস তোরা ওকে নিয়ে। এই যে মাষ্টার মশাই, স্নুমি আসে নি এখনো।

স্নুমিতার ছোট ভাই জবাব দিলে, না ছোড়দি বাবার সঙ্গে বেরিয়েছে।

ভূতনাথবাবু এতক্ষণে বল্লেন, আমার একটু কথা ছিলো।

বলুন।

ভূতনাথবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেনঃ "আমার ছোট একটি বোন, কাল রাতে মারা গেছে। তাই আজ এসেছিলাম দুদিনের ছুটি নিতে"

সুমিতার দিদির সমস্ত মুখটা লাল হয়ে গেল। ভাইদের দিকে বল্লেন—"তোরা কি জানোয়ার? তারপর ভূতনাথবাবুর দিকে ফিরে এবার বল্লেনঃ "আপনাকে আর এ বাড়ীতে আসতে হবে না ভূতনাথ-বাবু। এরা থাকতে নয়। কথাটা বলে সুমিতার দিদি একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেক মজার ঘটনার মধ্যে এটি একটি।

শেষ শর্যন্ত ভূতনাথবাবুকে চাকরি কিন্তু ছাড়তে হল না। সুমিতার বাবা কড়া মেজাজের লোক। বাড়ীর ছেলেদের ওপর আদেশ জারী হলঃ মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে তাদের কোন প্রয়োজন নেই, কাজেই কথাবার্ত্তা বলবার দরকার হলে বাড়ীর বাইরে, বাড়ীতে আর নয়। সুমিতার দাদারা চটলো, কারণ এতে তাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রেষ্টিজ গেলো। সুমিতার ছোট ভাই এরা চটলো বুঝতে না পেরে যে দাদাদের কেন মেজাজ গরম হল হঠাৎ তাদের ওপর। শুধু কালো বেঁটে, মোটা নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল, মাথার সামনের দিক কেশ বিরল. দাঁত পানের ছোপধরা—ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী আগের মতই পড়িয়ে যেতে লাগলেন লরোটোর ছাত্রী—সুমিতা গাঙ্গুলীকে।

কিন্তু এ-গল্প তোমায় বলা যেত না সবিতাদি—যদি ভূতনাথবাবুর এমনি আসা যাওয়াই চিরকাল চলত। একদিন সত্যিই এ বাড়ীতে আসা তার বন্ধ হল। কিন্তু শুধু বন্ধ হলেও এ-গল্প হত না। ভূতনাথ বাবু একদিন—

সবিতাদি, একি তুমি যে আগে থেকেই নড়ে চড়ে বসছো—দাঁড়াও আসল গল্পটা সুরু করি। তোমার এই আগেই উত্তেজিত হয়ে ওঠাটা

অনেকটা হাসির গল্প শুনতে হলে হাসির জায়গায় আসবার আগেই যারা হেসে গড়িয়ে পড়ে অনেকটা তাদের মত হল যে।

হ্যাঁ, ভূতনাথবাবু একদিন পড়াতে এলেন, রোজ যেমন আসেন, তেমনি। সুমিতা তাকে বল্লে, মাষ্টার মশাই, আজ আমি যাচ্ছি এক বন্ধুর বিয়েতে। আজ পড়ব না। আপনি কিন্তু চা খেয়ে তবে যাবেন। সুমিতা চলে গেল। মোক্ষদা চা দিয়ে গেল। ভূতনাথবাবু হাতের ব্যাগটা কাপটা টেবিলের ওপর রেখে, মানুষ যেমন করে জল খায়, তেমনি করে ঢক্ ঢক্ করে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিতে লাগলেন। সেদিন খুব তৃষ্ণার্ত্ত ছিলেন তিনি। তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে তিনি থেমে গেলেন। সিঁড়ির গায়েই একখানা ছেট ঘর—পর্দাটা সরে গেছে সিঁড়ির ওপরের জানলাটায়। সুমিতা কাপড় ছাড়ছে, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না; শুধু একটা আট কাঁচুলি ঠেলে বুক খানিকটা বেরিয়ে এসেছে। ধবধবে সাদা বুক—মাংস প্রচুর। এমন কি কাঁচুলীটা পর্যন্ত ঘেমে ভিজে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ভূতনাথবাবু। সুমিতার হাত এসে সায়ার ফিতের কাছে, থামলো। বাঁধন আলগা হয়ে এলো। সাদা কোমরের বেড় ঘিরে লাল হয়ে বসেছে দাগ। আর একটু। ভূতনাথবাবু কিছুতেই নামতে পারলেন না। সব তার ভুল হয়ে গেল । কালো বেঁঠে মোটা, নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্ত সুপুরীর মত একটা আচিল, মাথার সামনে দিক কেশ বিরল, দাঁতে পানের ছোপধরা ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন তার ছাত্রী সায়াটা পুরো কখন খুলে ফেলে। কিন্তু দেখতে তিনি পেলেন না। বরং তাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলে সুমিতার বড়দা।

ভূতনাথবাবুর এরপর যেটুকু মনে আছে তা শুধু সুমিতার বড়দার একটা চীৎকার: "আপনি ওখানে কি করছেন?" অন্য কেউ হলে একটা যে কোনও যত দুর্বলই হোক যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করত। ভূতনাথবাবুর পক্ষে তার কিছুই সম্ভব হল না। জ্ঞান তিনি হারান নি। কিন্তু সুমিতাদের বড় ঘরে কে তাকে কি বলল কিছুই তার মনে নেই।

যে বিরাট হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়ীতে তাতে সুমিতার বাবাও বিচলিত হতে বাধ্য হলেন। সুমিতা শুধু এসে বলল, মাষ্টার মশাই আপনি বেরিয়ে যান,আর আমায় পড়াতে আসবার চেষ্টা করবেন না কোনও দিন।

ওপরে উঠে এসে পড়ার ঘরে খিল দিয়ে টেবিলে বসে পড়ল। ছটা বাজলো ঘড়িতে.পরপর আওয়াজ হল ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। একটি একটি করে হাতুড়ীর ঘা পড়লো আরেক জনের বুকে। গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম একটি সন্ধ্যে এলো যখন ঘড়িতে ছটা, পড়ার ঘরে সুমিতা, শুধু টেবিলের ওদিকে সেই কালো, মোটা বেঁটে, নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল, মাথার সামনের দিকে কেশ বিরল, দাঁত পানের ছোপধরা ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী নেই তার জায়গাটিতে।

টেবিলের ওপর ভূতনাথবাবুর ব্যাগটা পড়ে আছে। তুলতে গিয়ে সেটা ভারী ঠেকল সুমিতার। ব্যাগটা খুলে ফেললে--বেরুল একটা মোটা খাতা ভূতনাথবাবুর ডায়েরী। সুমিতা ভূতনাথবাবুর ডায়েরীতে পড়লে ··

"আমার নাম ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী। বিকলাঙ্গ কোনও লোকও বোধ হয় আমার চেয়ে বেশিঠাট্টা লোকের পায়নি। বিকলাঙ্গ লোককে সহানুভূতি করবার লোক আছে কিন্তু যেদিন থেকে প্রথম আমি স্মৃতিতে কথা ধরে রাখতে পেরেছি সেদিন থেকে আমার বুকে একটি দগদগে ঘা আজও আমি লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রথম জ্ঞান হয়ে মার মুখে শুনেছিলাম, মা আমায় বলেছিলেন ঃ "আমার পেটে তুই এলি কি করে ?" সেই থেকে সেই ঘা একটুও শুকোয় নি। আজও যখনি কেউ আমার চেহারা দেখে হাসে, তখনি সেই পোড়া দাগের জায়গাটা যেন জ্বালা করে উঠে। ··

সুমিতাকে ডাকতে এসে লোক ফিরে গেল। সুমিতার বাবা বল্লেন যাক ঃ shock পেয়েছে। সময় দও, ঠিক হয়ে যাবে।

সবিতাদিকে বললাম তুমি ভাবছ গল্প বুঝি এইখানেই শেষ। না এইখানে সুরু। এ পর্য্যন্ত যা বললাম, তা সত্যি। অন্তত যে আমায়

বলেছিলো, তার কথা এ পর্য্যন্ত আজও আমি বিশ্বাস করতে রাজি আছি। কিন্তু এরপর নয়। এরপর সে আমায় যা বলেছিলো সেটুকুই বানানো। তবু সেটুকু না বল্লে যেটুকু বলেছি সেটুকু বলার কোন মানে হয় না, তাই শোন।

এরপর সুমিতাদের বাড়ীতে ভূতনাথবাবুর নাম আর কেউ শোনেনি। শুধু সুমিতার দাদা একদিন খাবার টেবিলে বল্লেন: ওরে সুমি—সেই রাস্কেলটা নাকি বিয়ে করেছে। তোর সেই বদমায়েস মাষ্টারটা।

সুমিতার দিদি বল্লেন ছিঃ। রাস্কেল বলছ কেন। সুমিকে সে না একদিন পড়িয়েছিল?

আট বছর বাদে অনেক রাতে একদিন সেই ভূতনাথ চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর দরজায় কড়া ভেঙ্গে পড়ার মত হতে, ভূতনাথবাবু নীচে নেমে এসে যাকে দেখলেন, আগে তিনি কোনও দিন তাকে দেখেছেন বলে মনে হোল না।

"আমরা এসেছি সুমির কাছ থেকে"—একজন নিজে থেকে বল্লে, 'সুমি' বিমূঢ় ভূতনাথবাবুর প্রশ্নের উত্তরে এর পরে সুমির দাদা বল্লেন: আপনার ছাত্রী সুমিতা গাঙ্গুলী। আপনাকে একবার এখুনি আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে। গাড়ী এনেছি।

কেন?

গিয়ে শুনবেন।

কিন্তু শুনতে কিছু হল না ভূতনাথবাবুর। গিয়ে দেখলেন সুমিতা শুয়ে আছে খাটে, ডাক্তার পাশে। সুমিতা বকছে: কেন আপনি আমায় বলেন নি একথা মাষ্টার মশাই আমায়ও কি ভুল বুঝেছেন?… আট বছর আগেকার এক স্মৃতি—যেন মানুষের মত এসে দাঁড়ালো। আট বছর আগেকার সেই ধরা পড়ে যাওয়া সন্ধ্যে। কিন্তু একি সম্ভব? মাটিতে বসে পড়ে ভাবলো কালো, বেঁটে, মোটা নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্ত সুপুরীর মত আঁচিল মাথার সামনের দিকে কেশ বিরল, দাঁত পানের ছোপধরা ভূতনাথ চক্রবর্ত্তীর মাথা ঘুরতে লাগলো, এ কি সম্ভব?

ভূতনাথ এক সপ্তাহ রাত্তির জেগে, দিনে না ঘুমিয়ে যার সেবা করলে সে কিছুই জানলো না। কারণ যেদিন প্রথম তার জ্ঞান ফিরে এলো, সেই দিনই প্রথম বোঝা গেল—মানসিক বিকার ভূতনাথবাবুকে ধরেছে।

গল্প শেষ করলাম। সবিতা উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালো।

আমি উঠে গিয়ে সোজা বল্লাম ঃ কি বলো, এ গল্প বানানো ?—তুমি বললে আর বিশ্বাস করব না। তোমার চোখ বলছে—

এতক্ষণে তাকালাম, সবিতাদির দিকে। সবিতাদি কাঁদছে ?

তুমি কি ছেলেমানুষ সবিতাদি। সত্যিই বলছি, একদম বানানো গল্প।

বানানো ?—সবিতাদি ধরা গলায় বলে।

হ্যাঁ, সত্যি বানানো।

এবারে সবিতাদি হাসলে। আশ্বস্ত হলাম।

কান্না ও হাসিতে অপরূপ সবিতাদি বল্লে ঃ স্মিতা নয় যে মেয়েটিকে পড়াতেন তার নাম সবিতা গাঙ্গুলী। তোমার সবিতাদি।

ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে বার করে নিয়ে এলো কালো মস্ত একটা বই।

খুলে দিলে আমার সামনে। পড়তে লাগলাম···

আমার নাম ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী···

আফিং

ডাক্তার বলে যাচ্ছিলেন—

প্রায়ই একটা জিনিস আমায় আকর্ষণ করে। জিনিষটা আর কিছুই নয়, নানান পত্র-পত্রিকায় ছাপা একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় : 'আপনার দেখা বিচিত্র মানুষ'। আমি নিজে মোটেই প্রবন্ধ পড়তে পারিনে বলে নয়, ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকে শুধু এই কারণে যে পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধকার, 'বিচিত্র মানুষ' বলতেই ধরে নেন কোনও মহৎ মানুষ ; অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি যাকে অতি সামান্য একজন অখ্যাত লোক বলে দাঁড় করাণ, প্রবন্ধ শেষ হবার আগেই তাকে দিয়ে তিনি এমন কোন অসামান্য কাজ করিয়ে নেন যে পাঠকের চোখ হয় অশ্রুসজল, পাঠিকার রুমাল—ভিজে। একবাক্যে যে পড়ে সেই বলে 'সাবাস,' একেই বলে অভিজ্ঞতা।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেয়েও বিচিত্র কিছুই কি সত্যিই নেই ? মানুষ কি নির্ভেজাল ভালো হয় ? কিংবা নিখাদ সোনার মত মন্দ ? এক মুহূর্ত আগেও যাকে মনে মনে দেবতা বলে নমস্কার করেছেন পরের মুহূর্তেই হয়ত সে এমন কিছু কাজ করে বসল যার থেকে তার চেহারার সঙ্গে শয়তানের অবয়বের তফাৎ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে হয়ত আপনারই। বাইরে থেকে যাদের দেখে মনে হয় ভারি ভালোমানুষ, তাদের মনের সমস্ত চিন্তা যদি আপনি পড়তে পারেন, নির্মল মুখের নীচে কত কদর্য কথা আর শান্ত দুটি চোখের তলায় কি হিংস্র দৃষ্টি মানুষের হতে পারে তার নজীর দেখে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। মন্দ চরিত্রের মানুষ যে অবস্থায় পড়ে মন্দ কাজ করতে বাধ্য হয় যদি পুরোপুরি তার পারিপার্শ্বিক আপনার জানা সম্ভব হোত, যদি আপনার এমন কোন উপায় জানা থাকত যাতে পরের মনের প্রত্যেকটি চলাফেরার প্রতিটি মোড় নেওয়ার পেছনে

কোন বৃত্তি কাজ করছে জানা সম্ভব হোত তাহলে দেখতেন তার কাজে 'ছি' বলবার আগে দুবার থেমে তার পর কোন মত না দিয়ে নীরব হওয়া ছাড়া আপনার গত্যন্তর ছিলো না। মানুষ একটানা মহৎ নয়, অবিকল মন্দও নয়, টুকরো টুকরো ঘটনার জোড়াতালি দেওয়া জীব সে।

এমনিই বিচিত্র কি না জানিনে একজন, যে মানুষের কথা আমি কখনো ভুলতে পারিনে, সে হোল চৌধুরীসাহেব ওরফে নন্দ চৌধুরী। নন্দ চৌধুরীকে আপনারা অনেকেই চিনিবেন, শেষ স্বদেশী এক্সিবিসন যেবার কলকাতায় বসে সেবার নন্দ চৌধুরীকে দেখতে যাননি এমন কেউ যদি আপনাদের মধ্যে থেকে থাকেন ত সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলব আপনি কি হারিয়েছেন আপনি জানেন না। সেই শেষ স্বদেশী এক্সিবিসনে নন্দ চৌধুরী সংখ্যাহীন বিস্ফারিত দৃষ্টির সাম্নে জীবন্ত কাঁচা পাঠা খেয়েছিল একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে, যেমন কেউ খুব প্রিয় কোন জিনিষ ভোগ করে খুব ভয়ে ভয়ে বুঝি এই ফুরিয়ে গেল, এই বুঝি আর রইল না। এক্সিবিসনে লোক আসে কিনতে নয়, স্বদেশী বস্তুর প্রতি প্রেম পড়ে নয়, আসে আদিম পাশব প্রকৃতি চরিতার্থ করতে চোখ দিয়ে। নন্দ চৌধুরী খায় কাঁচা পাঠা, কিন্তু লালা নিঃসরণ হয় জামা কাপড়ের তলায় আদিম মানুষ যে তার জিব থেকে।

নন্দ চৌধুরীর বিখ্যাত তালি দেওয়া প্যাণ্টের জন্য, তাকে আমরা, আমরা মানে তার ঘনিষ্ট পরিচিতেরা তাকে ডাকতাম, চৌধুরীসাহেব বলে। সাহেব বললে সে ভারি খুসি হোত বুনো জানোয়ারের মত কদাকার আর কালো, আর হিংস্র ভয়ঙ্কর তার মুখে সাহেব কথাটা এনগ্রেভ করে দিতো একটু-সময়ের খুসী। সেই এক্সিবিশন চলবার সময়ই কোন কোন দৈনিকে বেরিয়েছিল তার মুখের অনুকৃতি, ৫৫ স্ক্রীনের হাভটোনে, বিলেতি কাগজেও আর সেই ছবির সঙ্গেই ছিলো আরেক টুকরো আরও ছোট খবর: নন্দ চৌধুরী অসুস্থ। এই অসুস্থতার পর নন্দ চৌধুরী আর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে কোনও দিন দেখা

যায়নি, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কোনও খবর দিতে সক্ষম হয়নি। তারপর এক সময়ে সকলেরই অনুসন্ধিৎসায় ভাঁটা এলো। আমিও ভুলে গেলাম চৌধুরী সাহেবকে।

উনিশশো তিরিশ সালের জানুয়ারী মাসে আমি পনেরো দিন রঁাচীতে কাটাই। মা মারা গিয়েছিলেন সেই জানুয়ারী মাসেই। রঁাচীতে মায়ের নামে একখানা বাড়ি ছিলো দাদামশায়ের দেওয়া। পারিবারিক ঝড়-ঝাপটায় সে বাড়ি বহুকাল আগেই বিক্রী হয়ে যায়। আমরা চিরকাল তার গল্পই শুনে এসেছি চোখে দেখিনি কখনো। সেবার রঁাচী যাওয়ারএকটা উদ্দেশ্য ছিলো তাই, এবং সেই সঙ্গে বিশ্রামের দরকারও ছিলো বড় বেশী। ফিরে আসবার চার দিন আগে গিয়াছিলাম বাসে করে কাঁকের পাগলা গারদ দেখতে।

পাগলা গারদে ঢুকেছিলাম যত উত্তেজনা নিয়ে, ভেতরে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে তা নিভে গেল। পাগলদের মধ্যেও সাদা কালো আলাদা করে রাখা আছে। পাছে কালো পাগলদের ছোঁয়ায় সাদা পাগলদের মাথা ঠিক হয়ে যায়, বোধ করি এই ভয়ে। কয়েকটি মেয়ে পাগল নিয়ে একটি ঘর। ঢুকে মনে হোল কোনও রূপকথার পৃথিবীতে বুঝি এসে পৌছলাম। কোন বিস্মৃতির দণ্ডে কারা বুঝি বোবা হয় আছে অনন্তকাল। স্মৃতির রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে কোন পাগলা দৈত্য। চোখের চাওয়া আছে। দৃষ্টি নেই। ঘর থেকে বেরিয়েই ছঁাৎ করে উঠল বুক। দরজার পাশে এক পাটি চটি নিয়ে যে দাঁড়িয়ে সে .বুঝি কোন প্রেতপুরীর বাসিন্দা! কৃষ্ণ পাগলদের দেখে যখন ফিরছি তখন একটি চীৎকার কানে এলো: একটা বিড়ি দেবেন স্যার? বিড়ি?—শুনে শুনে কান ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও মজা দেখবার জন্যে একবার ঘুরে দাঁড়ালাম। ফিরে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হাজার চেষ্টা করেও মুখ চেপে ধরতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: চৌধুরী সাহেব?

খুসী উড়ে গেল নিমেষে। রাগে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে চলল পাগল। সঙ্গের গার্ড জিজ্ঞেস করলো, চৌধুরী সাহেবকে চেনেন

না কি? হাসলাম। চৌধুরী সাহেবকে চিনি? না সত্যিই এ চৌধুরী সাহেবকে ত চিনি না। আমি যাকে চিনতাম—সেছিলো অন্যরকম পাগল।

আমাদের আলাপ ইজের-পরা বয়স থেকে। কিংবা তারও আগে। তখন চৌধুরী সাহেব ওরফে নন্দ চৌধুরী আমাদের কাছে আমাদের নন্দা। নন্দাকে প্রথম ভয় করতে শিখি নন্দাদের বাড়ি খেলতে গিয়ে। গেটে ঢোকা মাত্র নন্দার চীৎকার: মজা দেখে গোকুল। চোখ তুলে দেখি তেতলায় ছাদে নন্দা বাচ্চা বেড়াল নিয়ে খেলছে, খেলা সাঙ্গ হয় অল্পেই। নন্দা এক সময় ফেলে দিলে বাচ্চাটাকে। ফেলে দিলে বল্লাম, ভুল বল্লাম। সেখান থেকে আছাড় দিল মার্জারবককে। মাটিতে পায়ের প্যাড পেতে দিতে পারলে না ঠিকমতো। ঘাড়টা মটকে গেলো। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। কী বীভৎস চীৎকার! পুরো আধ ঘণ্টা বাচ্চাটা চীৎকার করে তারপর থামলো আর আওয়াজ করলো না। বেড়ালের কান্না থামল, সুরু হোল নন্দার হাসি। না ভোলবার মত যদি কিছু সেই সাত বছর বয়সে সঞ্চয় করে থাকি, ত সেই একটা স্মৃতি দাগ কেটে বসে গোছ আমার কচি মনে। কিন্তু নন্দার যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে হিড় হিড় করে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্ল: চল, চল খেলবি চল। ওটাকে জমাদার নিয়ে যাবে অখন। তারপর বড় হয়েও এই নিয়ে মনে মনে অনেক জাল বুনেছি যাকে আপনারা বলেন বিশ্লেষণ। ওরা বলে এ্যানলিসিস। শেষ সিদ্ধান্তে যা এসেছি তাহলো নন্দা সুস্থ নয়। এবং একদিন বিশেষজ্ঞদের সায় থেকেই জানতে পারলাম চৌধুরী সাহেব মানসিক অসুস্থ। কিন্তু মাঝের কটা ঘটনা কোন অসুস্থ লোকের পক্ষেও বুঝি অকল্পনীয়।

নন্দাকে দ্বিতীয়বারে যে ভাবে দেখলাম তা আরও অসম্ভব। আরো ভয়াবহ। গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরে নন্দার ওখানে গেছি। নন্দার মা বল্লেন নন্দা তেতলায়। বাচ্চাদের নিয়ে কি যেন করছে, তুমি ওপোরে যাও। গিয়ে যা দেখলাম তাতে আজ মনে হয় সেখানে

না যাওয়াই ছিলো উচিত। চার দিকের ছোট ভাই আর বোনদের মাঝখানে নন্দা বসেছে রাজার মত। একটা দড়িতে পা গুলো বেঁধে একটা ইঁদুরকে ধরে বসে আছে আর একজন ভাই। নন্দা তার গায়ে ফোটাচ্ছে একটা বড় ছুঁচ। ছোটরা হাত তালি দিচ্ছে। ইঁদুরটা চেঁচাচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে টিনের ওপর ধারালো কিছু দিয়ে যেন কেউ ঘসছে। সমস্ত শিরায় কে যেন ছুরির ফালা দিয়ে বিঁধিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নন্দা নির্বিকার বুদ্ধের মত বসে। আর ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে পেটে, ল্যাজে, চোখের নীচে। দুহাত দিয়ে নিজের চোখ দুটোকে ঢেকে ফেলবার আগে ইঁদুরটাকে শেষবারের মত দেখলাম ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত এসে পড়ছে ঠোঁটের ওপর আর ঠোঁট দিয়ে তা চুষছে গনেশবাহন। ইঁদুরের কান্না আর নন্দার হাসি। নন্দাকে ঠিক মনে হোল কেউ না থাকলে বোধ হয় ইঁদুরটাকে খেয়ে ফেলে চিবিয়ে ; খুব সুস্বাদ খাবার পেলে জীব যেমন সিক্ত হয়ে ওঠে ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে যায় ইঁদুরটার সাম্নে বসা নন্দাকে ঠিক তেমন মনে হোল। নন্দা আমাকে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল, তোরা খেল আমি আসছি।

এরপর শীকারের নেশায় পেয়ে বসল নন্দাকে। কোত্থেকে জোগাড় করলে একটা এয়ার গান। ছররা আপনি এসে হাজির হলো। তারপর কিছুদিন আর নন্দাকে চান করতে দেখলে না কেউ, খেতে এলো না বিকেলের আগে। ক্লাসে দেখা গেল না, তখন নন্দার মা বল্লেন, দে বাবা, ওকে কিছুদিন ঐ নিয়েই থাকতে দে। ঝোক যেমন এসেছে আবার চলেও যাবে তেমনি।

কিন্তু একদিন বেলা চারটের সময় নন্দার ছোট ভাই এলো হন্তদন্ত হয়ে। দাদা এখনোও বাড়ি ফেরেনি, মা কান্নাকাটি করছেন। আপনি চলুন। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কোনও যায়গায় যখন নন্দাকে পাওয়া গেল না এবং হাল আমরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন কে এসে যেন খবর দিলে ঘোষেদের বাগানে নন্দাকে দেখা গেছে।

ঘোষেদের বাগান বাড়িতে নন্দাকে সত্যিই পাওয়া গেল। ঘোষেদের বদমায়েস ছেলেটাকেও। গিয়ে দেখি একটা চড়াই ছটফট করছে। নন্দ একফোটা জল দিচ্ছে ওর ঠোঁটে আর তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে দেখছে। জল পেয়ে পাখীটা যত আরোও জলের জন্যে হাঁ করে, নন্দা তত জল না দিয়ে মজা দেখে। তারপর এক সময়ে চড়াইটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খতম হয়ে গেল ছটফটানি। নন্দা তখন উঠে সমস্ত জলটা উপুড় করে দিল চড়াইটার ঠোঁটের ওপর। বল্লে, খা কত খাবি এবার। হা হা করে হেসে উঠল ঘোষেদের বদমাইস ছেলেটা।

সতেরো বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিলো নন্দা, বিয়ে করলো আঠারোয়। নন্দার মাকে পাড়ার পাঁচজন বুঝোলে লেখাপড়া হবেনা নন্দার আর লেখাপড়ার দরকারই বা কি? একটা ছেলে, চলে যাবে যেমন তেমন করে হোক কিন্তু ভয় হচ্ছে ওর বাতিক নিয়ে মানুষের চেহারায় জানোয়ারের প্রকৃতি বরদাস্ত হবে না কিছুতেই। অতএব বিয়ে দিয়ে দাও নন্দার, কথাটা মনে ধরলো নন্দার মায়ের এবং সত্যিসত্যি নন্দার বউভাতে আমরা খেয়ে এলাম।

বিয়ে দিলে কোনো ব্যামো সারে এ বিশ্বাস করবার কোন কারণ না থাকা সত্বেও আমাদের মনেও যে কোন miracle কখনো-সখনো উঁকি ঝুঁকি না মারত তা নয়। ভাবতাম বিয়ের জল পড়লেই নন্দার মনের গ্র্যানাইট একটু নরম হবে, তার উৎকট পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে একটু একটু করে ফাটল ধরবে। স্ত্রীর প্রেমের ঘন নীরস ছায়া পড়বে রৌদ্ররুক্ষ নন্দার মনের মাটিতে, তারপর ছেলেপুলে হলে অসন্তোষের অজগর মুখ লুকোবে অন্ধকার বিবরে। আত্মজ যখন প্রথম ছুটতে গিয়ে আহত হবে, বাধা পাবে দাঁড়াতে গিয়ে, তখন থেকেই অন্তর্হিত হতে থাকবে অসহায় পশুবকদের অকারণ আঘাত কোরে নিষ্ঠুর আনন্দ পাবার বীভৎস লিপ্সা।

কিন্তু কোনো কোনো মাঠকে দূর থেকেই সবুজ দেখায় মাত্র কাছে এলেই রঙ ছুটে যায় মনে হয় নিঃসন্তান বিধবার বুকের মতো।

না যাওয়াই ছিলো উচিত। চার দিকের ছোট ভাই আর বোনদের মাঝখানে নন্দা বসেছে রাজার মত। একটা দড়িতে পা গুলো বেঁধে একটা ইঁদুরকে ধরে বসে আছে আর একজন ভাই। নন্দা তার গায়ে ফোটাচ্ছে একটা বড় ছুঁচ। ছোটরা হাত তালি দিচ্ছে। ইঁদুরটা চেঁচাচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে টিনের ওপর ধারালো কিছু দিয়ে যেন কেউ ঘসছে। সমস্ত শিরায় কে যেন ছুরির ফালা দিয়ে বিঁধিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নন্দা নির্বিকার বুদ্ধের মত বসে। আর ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে পেটে, ল্যাজে, চোখের নীচে। দুহাত দিয়ে নিজের চোখ দুটোকে ঢেকে ফেলবার আগে ইঁদুরটাকে শেষবারের মত দেখলাম ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত এসে পড়ছে ঠোঁটের ওপর আর ঠোঁট দিয়ে তা চুষছে গনেশবাহন। ইঁদুরের কান্না আর নন্দার হাসি। নন্দাকে ঠিক মনে হোল কেউ না থাকলে বোধ হয় ইঁদুরটাকে খেয়ে ফেলে চিবিয়ে; খুব সুস্বাদ খাবার পেলে জীব যেমন সিক্ত হয়ে ওঠে ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে যায় ইঁদুরটার সাম্নে বসা নন্দাকে ঠিক তেমন মনে হোল। নন্দা আমাকে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল, তোরা খেল আমি আসছি।

এরপর শীকারের নেশায় পেয়ে বসল নন্দাকে। কোত্থেকে জোগাড় করলে একটা এয়ার গান। ছররা আপনি এসে হাজির হলো। তারপর কিছুদিন আর নন্দাকে চান করতে দেখলে না কেউ, খেতে এলো না বিকেলের আগে। ক্লাসে দেখা গেল না, তখন নন্দার মা বল্লেন, দে বাবা, ওকে কিছুদিন ঐ নিয়েই থাকতে দে। ঝোক যেমন এসেছে আবার চলেও যাবে তেমনি।

কিন্তু একদিন বেলা চারটের সময় নন্দার ছোট ভাই এলো হন্তদন্ত হয়ে। দাদা এখনোও বাড়ি ফেরেনি, মা কান্নাকাটি করছেন। আপনি চলুন। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কোনও যায়গায় যখন নন্দাকে পাওয়া গেল না এবং হাল আমরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন কে এসে যেন খবর দিলে ঘোষেদের বাগানে নন্দাকে দেখা গেছে।

ঘোষেদের বাগান বাড়িতে নন্দাকে সত্যিই পাওয়া গেল। ঘোষেদের বদমায়েস ছেলেটাকেও। গিয়ে দেখি একটা চড়াই ছটফট করছে। নন্দ একফোটা জল দিচ্ছে ওর ঠোঁটে আর তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে দেখছে। জল পেয়ে পাখীটা যত আরোও জলের জন্যে হাঁ করে, নন্দা তত জল না দিয়ে মজা দেখে। তারপর এক সময়ে চড়াইটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খতম হয়ে গেল ছটফটানি। নন্দা তখন উঠে সমস্ত জলটা উপুড় করে দিল চড়াইটার ঠোঁটের ওপর। বল্লে, খা কত খাবি এবার। হা হা করে হেসে উঠল ঘোষেদের বদমাইস ছেলেটা।

সতেরো বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিলো নন্দা, বিয়ে করলো আঠারোয়। নন্দার মাকে পাড়ার পাঁচজন বুঝোলে লেখাপড়া হবেনা নন্দার আর লেখাপড়ার দরকারই বা কি? একটা ছেলে, চলে যাবে যেমন তেমন করে হোক কিন্তু ভয় হচ্ছে ওর বাতিক নিয়ে মানুষের চেহারায় জানোয়ারের প্রকৃতি বরদাস্ত হবে না কিছুতেই। অতএব বিয়ে দিয়ে দাও নন্দার, কথাটা মনে ধরলো নন্দার মায়ের এবং সত্যিসত্যি নন্দার বউভাতে আমরা খেয়ে এলাম।

বিয়ে দিলে কোনো ব্যামো সারে এ বিশ্বাস করবার কোন কারণ না থাকা সত্বেও আমাদের মনেও যে কোন miracle কখনো-সখনো উঁকি ঝুঁকি না মারত তা নয়। ভাবতাম বিয়ের জল পড়লেই নন্দার মনের গ্র্যানাইট একটু নরম হবে, তার উৎকট পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে একটু একটু করে ফাটল ধরবে। স্ত্রীর প্রেমের ঘন নীরস ছায়া পড়বে রৌদ্ররুক্ষ নন্দার মনের মাটিতে, তারপর ছেলেপুলে হলে অসন্তোষের অজগর মুখ লুকোবে অন্ধকার বিবরে। আত্মজ যখন প্রথম ছুটতে গিয়ে আহত হবে, বাধা পাবে দাঁড়াতে গিয়ে, তখন থেকেই অন্তর্হিত হতে থাকবে অসহায় পশুবকদের অকারণ আঘাত কোরে নিষ্ঠুর আনন্দ পাবার বীভৎস লিপ্সা।

কিন্তু কোনো কোনো মাঠকে দূর থেকেই সবুজ দেখায় মাত্র কাছে এলেই রঙ ছুটে যায় মনে হয় নিঃসন্তান বিধবার বুকের মতো।

শুকনো নীরস ব্যর্থ। কামনায় জর্জরিত যে পতিহীনা সমাজের অনুশাসনকে ভয় করে স্বাভাবিক পথে মেটাতে পারেনি মনের কামনা, নিজের পুত্রবধুকে অন্যায় সন্দেহ করে, ছোটখাট ত্রুটির তিল থেকে মহাপরাধের প্রকাণ্ড তাল রচনা করে চরিতার্থ হতে চেয়েছে যে, প্রতি মুহূর্তে নিজের এবং তার জীবন বিষময় করে, তার সেই বিকৃত মনের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হোল উৎকট অবিচারী পাশব প্রবৃত্তি। ফুলশয্যা পেরোতে না পেরোতে একদিন রাত্তিরে ঘুমন্ত বৌয়ের চুল কেটে ফেললে নন্দা আর সকালে বললে ক্রন্দন-নীরব নূতন বৌকে, আমি মারা গেলে সেই তো চুল কেটে ফেলতে হবেই, আগে থেকে কেমন দেখায় তাই জেনে গেলাম। শ্বশুর বাড়িতে খবর গেলো জামাই পাগল। বৌয়ের হাতে, পায়ের নখে সারা রাত্তির জাগিয়ে রেখে ছুঁচ ফুটিয়ে চললো নন্দা: আমি পাগল— যন্ত্রণার যেটুকু শান্তি চীৎকারে, নন্দার বৌ সেটুকু শান্তিও আর জীবনে কখনও খুঁজবেনা এই প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা আর কিছু নিজের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো নন্দা ভোরের দিকে। জেগে রইল ঘরের দাওয়ায় মুখে দগদগে ঘা নিয়ে আধ পাগলা খেঁকিকুত্তা আর ঘুমে এলোনা ঘরের মেঝেয় স্বামী-প্রেমতৃপ্তা আরক্তনয়নে।

এরপর ঘেন্নায় নন্দার মুখ থেকে মুখ ফিরিয়েছি। আমরা খবর পেয়েছি ছেলেকে পৃথিবীতে রেখে দিয়ে নন্দার বৌ বেঁচে যাবার জন্যে বেছে নিয়েছে গলায় দড়ি আর বঞ্চিত করেছে নন্দাকে গলা টিপে মেরে ফেলবার দুর্লভ সুযোগ থেকে। নন্দার মা কোথায় চলে গেছেন। নন্দা কি করতে কলকাতায় গেছে, বিপুল বিতৃষ্ণায় তার কোন হদিশ নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু নিলে এ গল্প আরও সম্পূর্ণাঙ্গ হতো—এ অভিজ্ঞতা হোত বিচিত্র। কাঁকের ডাক্তারের কাছেই খবর পেলুম নন্দাকে সেখানে দিয়ে গেছে তার এক বড়লোক পিসীমা কলকাতায় সিমলা ষ্ট্রীটে নন্দা ছাড়া নিজের বলতে যার আর কেউ নেই। কলকাতায় ফিরে সিমলা ষ্ট্রীটে সেই ঠিকানা বার করতে দেরী হলোনা, দেরী হলো নন্দার পিসিমাকে দিয়ে

নন্দার পাগল হয়ে যাবার ঠিক আগে কি কি ঘটনা ঘটেছিল তারই টুকরো টুকরো ঘটনা বলাতে। নন্দার ভাবনার কিছু ছিলোনা। খেতদেতো ঘুমোত। পিসিমাও নিশ্চিন্ত ছিলেন জানতেন না নন্দার অভাব কোথায়। শুধু এক একদিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতো পিসিমার। নন্দার ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখতেন ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড় করছে। এত নন্দা নয়, কোন নরখাদক। এই সময় নন্দার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটু একটু করে আফিঙের নেশা ধরা আর আর একটি নন্দার পিসিমা তখনও যা জানতেন না এখন জানেন, হাজার হাজার লোকের সামনে কাঁচা পাঠা বা মুরগী খেয়ে দেখানো। কয়েক দিন যাতায়াতের পর যখন পাগলামির কোনো সূত্র খুঁজে বার করতে পারলুম না তখন পিসিমাকে একদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলাম পাগল হবার ঠিক আগে নন্দা কারুর কাছ থেকে কোনো আঘাত পেয়েছিলো কিনা? পিসিমা হেসে জবাব দিলেন ঃ আঘাত ত সে কারুর কাছ থেকে পেতোনা; দিতেই ভালবাসতো তবে—। কি? আমি চমকে উঠলাম। একটা ঘটনা ঘটেছিল, পিসিমার গলায় যেন বিশ্বাস করবার মতো নয় এমন সুর, আমার মনে হয় সেটা কোন কারণ নয়। ডুবে যাবার আগে শেষ কুটোটা ধরবার আপ্রাণ চেষ্টায় আওয়াজ করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মনে যাই হোক না হোক আপনি বলুন। পিসিমা যা বলে গেলেন তা গল্প কিনা জানিনে কিন্তু বানানো নয়। সেই সময়টা নন্দা বিকেলের দিকে বাড়ির মধ্যে একটা একটু বাগানের মতো জায়গায় একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে আফিঙ খেতো। একদিন কোথা থেকে একটা ব্যাঙের বাচ্চা থপথপ্ করে সেখানে এসে হাজির হোলো আর নন্দা টপ করে তার হাঁয়ের মধ্যে টপ করে একটু আফিঙ ফেলে দিলো, তারপর রোজ সেই ব্যাঙ আসে থপ থপ করে আর নন্দা একটু একটু করে আফিঙ ধরায় তাকে।

হ্যারে রোজ ওকে আফিঙ খাইয়ে খাইয়ে নেশা ধরিয়ে দিচ্চিস এরপর ওকি দোকান থেকে কিনে খাবে? কেন পিসিমা? ওর

তো দোকানের দরকার নেই আফিঙ দরকার হলে আমার কাছ থেকেই পাবে। নন্দার জবাব শুনে পিসিমা হেসে চলে গেলেন।

পিসিমার সাক্ষ্যে প্রকাশ এই সময় নন্দার চেহারা একটু একটু করে বদলাতে লাগলো। রাতে দাঁতের কিড়মিড় বন্ধ হয়ে এলো। নরখাদকের মুখে ছায়া নামলো অপত্যের। সেই সময় রোজ কারা আসত নন্দাকে কোথায় নিয়ে যাবার জন্যে, নন্দা যেতে চাইত না দরাদরি থেকে কথা কাটাকাটি হোতো; শেষ পর্য্যন্ত কলহ। পিসিমা এখন বোঝেন যারা আসত তারা মেলার লোক। নন্দাকে দিয়ে কাঁচা পাঁঠা মুরগী খাইয়ে দুপয়সা রোজগার হতো তাদের। নন্দার অস্বীকৃতিতে তারা মনে করতো ওর দাম বাড়াবার কৌশল বলে। নন্দা তাদের সঙ্গে কখনও কখনও গেলেও ফিরে আসতে সন্ধ্যে হবার আগেই যখন অন্ধকার নামতো মাঠের ওপর আর থপ থপ করে আসতো সেই ব্যাঙের বাচ্চা নন্দার নেশার ভাগীদার। সারাদিন উদগ্র হয়ে থাকতো সমগ্র স্নায়ুকোষ সেই সময়টুকুর জন্যে। তারপর একদিন নন্দা রাত্তির বেলায় বেরিয়ে কোথায় যেন গেল, ফিরলনা পরের দিন বিকেলে। ডেকে ডেকে ব্যাঙের বাচ্চা পড়ে রইলো সেই মাটিতে মুখ থুবড়ে। তারপরদিন বিকেলেও নন্দার পাত্তা নেই। এলো তৃতীয় দিন সকালে গায়ে ১০৪ উত্তাপ নিয়ে, চোখ কোনও রকমে খুলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল: আমার ব্যাঙ?

সে তোমার আফিঙ না পেয়ে মরেছিল, ফেলে দিয়েছি তুলে—যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড তোর!

এর পরেই নন্দ পাগল হয়ে যায়।

অতিনায়ক

সমস্ত পাড়াটায় একটিমাত্র মুখ।

সকালবেলায় রাস্তায় জল দিতে এসে দুজোড়া চোখ চেয়ে থাকে অত্যন্ত নোংরা এই গলিটার ধ্বসে যাওয়া প্রাচীন বাড়ীটার কপাটহীন এই জানালাটার দিকে। সূর্য্য উঠবার আগে সেখানে এসে মল্লিকা মল্লিক রোজ কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে জল ছড়াতে থাকে অন্ধকার রাস্তায়। ভেবে পায় না কেউ;—পাড়ায় বড় রাস্তাগুলো পরিষ্কার হয় না রোজ কিন্তু আলো আসবার আগেই ন্যাড়াতলা সেকেণ্ড লেন কি কোরে চান কোরে নেয় একবার। তাদের কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। এক এক দিন ন্যাড়াতলা সেকেণ্ড লেনও অশুচি থাকে। সেদিন সকালে জানালা খোলে না। দশ বছরের পুরোন অভ্যেসও ভুল হয়ে যায় বনমালী আর শম্ভু বেহারার।

সুদূর উড়িষ্যা থেকে কোলকাতায় এই অপরিচিত গলিতে জল দিতে এসে যাকে হঠাৎ আবিষ্কার কোরেছে তারা, তাকেই সারারাত স্বপ্ন দেখে সাম্নের বাড়ীর সুন্দর ছেলেটা। তারই কথা ভাবতে ভাবতে পড়া ভুল হয়ে যায় ইউনিভার্সিটির পয়লানম্বর ঘোড়ার সওয়ারী ইকনমিকসের ছাত্র রাজশঙ্কর ত্রিপাঠীর। আরো আছে। বিলেত-ফেরৎ, পোর্ট কমিশনর্সের ভবিষ্যৎ সর্ব্বে-সর্ব্বা, কল্যান মিত্তির মল্লিকার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র-পারের নীলনয়নাদের চিঠির জবাব পাঠাতে ভুলতে আরম্ভ কোরেছে। আর,—ইঞ্জিনীয়র রায় বাহাদুর চারু চন্দের একমাত্র পুত্র অশোক চন্দ অনেক ঘাট ঘুরে নৌকা ভিড়িয়েছে এইখানে। বাজী মাৎ কোরবে বোধহয় সেই।

এরাই হোল এ নাটকে প্রধান। অবশ্য এরা ছাড়াও আরো দুশ্চরিত্রের অভাব নেই। কিন্তু তারা নেপথ্যবিহারী।

যাদের দাঁত উঠেছে এই কয়েক বছর আগে আর যাদের দাঁত

আলগা হতে খুব দেরী নেই, লোকে বলে, তারা সবাই না কি গুণগুণ কোরে ফেরে এই একটি মাত্র মল্লিকার চার পাশে। পাশের বাড়ীর সিংহিরা ত' একটা গানের ইস্কুলই বসিয়ে ফেললো তাদের বাইরের ঘরে। মল্লিকা মল্লিককে ডাকা হোল ছোট ছোট মেয়েদের গানের গলা তৈরী কোরে দিতে। কিছুদিনের মধ্যেই কোলকাতাকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে পোষ্টারে, পোষ্টারে। সবুজ-সঙ্ঘের আগামী গানের জলসা নিউএম্পায়ারে।

বাপ বহু দিন অসুস্থ! ভাইয়েরা দূর দেশে কাজ করে। মল্লিকার এবার থার্ড ইয়ার। রেডিও, গ্রামাফোন, পাব্লিক শো' থেকে সুরু হয়ে তার আমন্ত্রণ-লিপির ঠিকানা বহুদূর-বিস্তৃত। তাদের মধ্যে এমন সব বাড়ীও আছে যার সদর দরজা পেরুতে পারলে অনেকেই ধন্যবাদ জানাতো।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য মল্লিকার ঠোঁট কাউকে দেখেই বেঁকে না। একমাত্র জানলায় ঝুঁকে পড়ে সে ডাকাবে 'সমরদা।'

বহুদূর থেকে সমর সিংহ একবার ঘাড় ফেরাবে। ফিরে এসে দাঁড়াবে একবার জানলার নীচে। দু'মিনিট পাঁচ মিনিট প্রোগ্রাম সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে সমরের। বাড়ীর ঝি জল নিতে এসে দাঁড়িয়ে যাবে একবার। একটু আগেই দাদাবাবু কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে অপমান করেছে মা থেকে আরম্ভ করে সকলকে। কোমরটা একটু বেঁকিয়ে বসন্তে কোঁদা মুখটা কুঞ্চিত কোরবে একবার। বিরক্ত হলে এই তার অভ্যেস।

আর একটু বাদেই লাল রংএর নোতুন মরিস গাড়ীর হর্ণ বাজতে থাকবে। মল্লিকা যদি সাম্নে থাকে তবুও। বি, এল, বি'র অভ্যেসই তাই। মল্লিকার ছোট-ভাই কল্যাণকে ডাকে বি, এল, বি বোলে— আর গাড়ীর গায়ে লেখা,—অনেক কষ্টে সে অক্ষরগুলো পড়তে পেরেছে এটা বোধ হয় তারই বিজ্ঞাপন। কিম্বা তাও নয়। ছোড়দিকে সবচেয়ে ভালোবাসে সে। কিন্তু ছোড়দি,—সন্দেহ হয় বুলুর; ছোড়দি বোধ হয় তার চেয়েও বেশী পছন্দ করে কল্যাণকে, কিন্তু মুখে স্বীকার

করে না সে কথা। তাই রাগে বুলু বোধ হয় কল্যাণের নাম আনে না মুখে, তার নাম থেকেই সকলের এই এক অভ্যাস। কিম্বা গাড়ীটাই হয়ত শুধু মনে রাখবার মতো। কল্যাণকুমারের সত্যিকারের পরিচয়-পত্র।

হঠাৎ দেখলে বিশ্বাস কোরবে না কেউ, পোর্টকমিশনর্সে আড়ালে যাকে সবাই আপষ্টার্ট বলে (একটুতেই নাক কুঁচকোয় কল্যাণের), সেই কল্যাণ মিত্তিরই নর্দমার ধারে' সিড়ির শেষ ধাপে বসে পকেট থেকে লজেন্স বার কোরে দেয় বিলিকে। বিলির লাল পড়ে গোল হয়ে, পঁয়ত্রিশ টাকা দামের সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপর। কল্যাণ তা দেখতে পায় না, তার চোখ তখন মল্লিকাকে অনুসরণ কোরছে। আলস্য-ভাঙ্গবার একটি মধুর মুহূর্ত্তে মল্লিকাকে ভারী রমনীয় মনে হয়। একটু দূরে বুলু বমি কোরেছে। মাছি ভন্‌ভন্ কোরছে সেই ভূস্বর্গে। পাশের ঘর থেকে হরিনাথ বাবুর কাশির আওয়াজ সন্দেহজনক। তা-হোক, মল্লিকাকে; একদম একা পাওয়া,—কল্যাণ মিত্তির তার দাম জানে।

কিন্তু কল্যাণ মিত্তিরের মরিস-গাড়ীতে ঘোরে বলে —সহায়-সম্পদহীন রাজশঙ্কর ত্রিপাঠীর কথা ভোলে না মল্লিকা। তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলবার জন্যে রাজশঙ্কর নিশ্চিন্ত উপেক্ষা কোরতে পারে বহু কষ্টে জোগাড়-করা অধ্যাপক সরকারের অতি গোপনীয় অত্যন্ত দুর্লভ তথ্যপূর্ণ নোট;—যার জন্যে প্রিয়-বন্ধু-বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে। তবে বলা ত যায় না, প্রথম শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ জমিতে মুখ থুবড়িয়ে পড়তে পাড়লে একবার, সৌভাগ্য-প্রেরিত রজতচক্রের উজ্জ্বল আলো তার মুখেও দেখা যাবে হয়ত। রাজশঙ্করের বুদ্ধি ভোঁতা নয়। শুধু বইয়ের পাতায় কেন?— থিওরী অফ ভ্যালু কষে দেখবার চেষ্টায় আছে সে জীবনেই।

যখন তখন মল্লিকা আজ-কাল, 'মাসী'মা, 'মাসী'মা বলে আবার তার সামনের বাড়ীতে গিয়ে মাটীতেই পা ছড়িয়ে বসে। গুণ গুণ কোরে দু'লাইন গান গায়। খুব হেসে ও-বাড়ীর বড় বেকার ছেলেটার সঙ্গে গল্প করে। বাড়ীর ছোট মেয়েরা এতকাল সবাই তাকে ভয় করে

চলত। মল্লিকা তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়েছে। মলিদি বলতে আজ-কাল তাদের খুসীর শেষ নেই।

সিংহিদের বাড়ীতেই আজ-কাল মল্লিকার যাতায়াত। সব দিনই, কিছু গান শেখাতে হয় না তবু সকাল-সন্ধ্যে তার কাটছে সিংহিদের বড় ছেলেটার সঙ্গে গল্প করে। সুনীলদের বাড়ীতে আজ কাল রাত্তিরে রীতিমত আসর বসে একটা। অশোক চন্দ আসে। গানের ইস্কুলের সে একজন উৎসাহী কর্ম্মী। সন্ধ্যে না হতেই আসে হাই-ব্রো-সোসাইটির আরেকজন কাপ্তেন। তার শিষটা এখানে সকলেরই চেনা। মল্লিকা তাকে পছন্দ করে সব চেয়ে বেশী।

রাজার ছেলে নয় কিন্তু রাজপুত্তুরের মত চেহারা স্বর্ণকান্তির। প্রত্যেকটি কথা বহুবার ভেবে তবে মুখ থেকে বার করে সে। কিন্তু বার করে এমন কায়দায় যেন মনে হয় সে অন্যমনস্ক।

সবুজসঙ্ঘের সব চেয়ে নিঃস্বার্থ খাটিয়ে হোল নীলমণি হালদার। এখানে যারা আসে বোধ করি তাদের ব্যঙ্গ কোরবার উদ্দেশ্যে মোটা চটের মতো খদ্দরে নিজেকে মুড়ে আসে। কথায় কোন ধার নেই—কিন্তু সকলেরই যেন কেমন ভালো লাগে নীলমণিকে। বোধ হয় চাল না থাকাটাই তার চাল, মল্লিকা তাকে কোন দিন উৎসাহ দেয় ভীষণ, কোন দিন আবার বিমুখ করে অকারণেই। নীলমণিকে নিয়ে মজা করে মল্লিকা।

মল্লিকার ভয় শুধু একজনকে! নীচের তলার শ্রীপদকে। শ্রীপদকে শুধু মল্লিকা নয় অনেক পুরুষ-মানুষও এড়াতে চায়। একটা চোখ নেই শ্রীপদর। মুখটা গোল। গোল মুখের ওপর চ্যাপ্টা নাকের নীচে নিগ্রোদের মত পুরু ঠোঁট দুটো যখন হাসে তখন গা ঘিন-ঘিন করে মল্লিকার। কিন্তু শ্রীপদর স্বাস্থ্য তা বিকৃত মুখের জবাব। সকাল বেলায় সূর্য্যের আলোয় তেল মাখতে বসে যখন সে—চোখ ফেরাতে পারে না মল্লিকা।

কোন লোহার কারখানায় শ্রীপদ ভালো মাইনে আর তার চেয়েও ভালো অতিরিক্ত খাটনীর 'ডবল' পায়। সংসারে সে একলা মানুষ।

মল্লিকাদের বাড়ীর নীচের তলায় হু'খানা ঘর নিয়ে সে থাকে। সন্ধ্যেবেলায় সে যেদিন ফেরে সেদিন বোঝা যায় মদ খেয়েছে। কিন্তু কাউকে বিরক্ত করে না শ্রীপদ। বেরিয়ে যায় একটু পরেই। তারপর যখন ফেরে তখন কেউ জেগে থাকে না।

২

অশ্লীল ইয়ার্কি দিয়েই কাটছিলো বেশ। এরই মধ্যে এক দিন কানাকানি হাসাহাসির ভেতর দিয়ে দোতলার জানলা ভাঙ্গা সেই কোণের ঘরটায় খবরটা এসে পৌঁছন মাত্র সমস্ত উচ্ছ্বসিত হাসির স্রোত হঠাৎ যেন শক্ত পাথরে ধাক্কা খেলো জোর। প্রথম দেখেছে কে জানা গেল না। কিন্তু ব্যাপারটা না কি সত্যি? সিঁড়ির শেষ ধাপে সুনীল নাকি জড়িয়ে ধরেছিলো মল্লিকাকে—মুহূর্তমাত্র তা হোক। বাকীটুকু আঁচ কোরে নিতে দেরী হয়নি, উত্তেজনার মুখে পেয়ালা থেকে খানিকটা বিষ খেয়ে ফেললো নীলমণি। চাকে বিষ বলেই মনে কোরত সে এত কাল।

বাদ-বিসম্বাদ যা হওয়ার সম্ভাবনা সুনীল স্বয়ং তার কোন অবসর দিলো না। লক্ষ্য কোরল সকলেই, সুনীলের চেহারা বদলে গেছে হঠাৎ।

যারা দমে গিয়েছিলো, উঠে বসল তারা এতক্ষণে। আবার ঠাট্টা-হাসির ভেতর দিয়ে আড্ডা জমে উঠলো আস্তে আস্তে।

বরফ ভাঙ্গলো অশোক চন্দঃ 'কী হে তুমিই বাজীমাৎ কোরলে তাহলে!'

সুনীল কিন্তু লজ্জার ভাণ কোরল না এতটুকু। বরং আজ তার উচ্ছ্বাস বাধা মানলো না কোন কিছুর। উচ্ছ্বাসের মুখে আজ নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হোল সুনীল, মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের কত মিথ্যে গল্প এতকাল যে বলেছে, তাই ভেবে। এ তার নোতুন অভিজ্ঞতা, প্রথম রোমাঞ্চ। এখনো ভালো কোরে ভাবতে পারছে না সে। এ হুঃসাহস তার হোল কেমন কোরে? মল্লিকার ঠোঁটের ওপর একটা

তিল আছে। সেই তিলটাই এখনো যেন জ্বলজ্বল কোরছে। কতটুকু আর সময়—একটিবার মাত্র। তবু নিজের ঠোঁটে একবার, আর একবার যেন সুনীল আরেক জোড়া ঠোঁটের উত্তপ্ত স্পর্শ, উত্তপ্ত আর অনাস্বাদিতার সেই আশ্চর্য্য স্পর্শ অনুভব কোরতে চেষ্টা কোরল। অসম্ভব জ্বালা কোরতে লাগলো সুনীলের ঠোঁট দুটো।

অশোক চন্দ ততক্ষণে ঠিক কোরেছে তার প্ল্যান। মনে মনে সে তার কল্পনার সেই মানচিত্রকে একবার ছুঁয়ে যেতে যেতে ধিক্কার দিলো নিজেকেই। দেরী হয়ে গেছে অনেক।

নীলিমণি দমে গেছে একটু বেশী। মল্লিকার অঙ্গস্পর্শের প্রথম সৌভাগ্য তার। যদিও এত কাল সেই ঈর্ষাযোগ্য সৌভাগ্যকে ঠাট্টা কোরেছে সবাই। মল্লিকার পিঠে একবার হাত রেখে নীলমণিকে সান্ত্বনা দিতে শোনা গিয়েছিলো ; 'কেঁদ না বোন।' শুনে হেসেছিলো সবাই! কিন্তু নীলমণির ধরণই ওই। তবুও সুনীলকে উপদেশ দেওয়ার একটা তীব্র বাসনা হোল নীলমণির। 'সুনীল কি সত্যিই ভালো কোরছে?'—ভাবতে চেষ্টা কোরল সে।

শুধু স্বর্ণকান্তি মুখে কিছু বলেনি। কথামালার একটা গল্প মনে পড়ে গেলো তার। সত্যিই তীর এসেছে অন্য দিক থেকে। জেতা সম্বন্ধে ভয় কোরছিলো অশোককে, কিন্তু সুনীল এলো কী কোরে। হিসেবে এত বড় ভুল। শোধরাবার সময় হবে কী?

ভাবনা আর আলোচনা অন্তহীন, কিন্তু মল্লিকার এতক্ষণে আর কিছু মনে নেই। কাল সকালে ভুলে যাবে সব।

সন্ধ্যে থেকেই ঘুর ঘুর করেছিলো সুনীল। কী বোলবে আঁচ কোরতে দেরী হয়নি তার। কতবারই ত হোল জীবনে। সুনীলের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর কোরেছে সে। ঠোঁটের ওপরের তিলটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলেছেঃ এইখানে। দিশেহারা হয়ে গেলো যেন ছেলেটা। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। কিন্তু মল্লিকা একেবারে ঠাণ্ডা। মনে পড়ে গেলো সুনীলের সেই সব বক্তৃতা আর মেয়েদের সম্বন্ধে নোতুন নোতুন থিওরী। এদিকে আসলে ত সবাই এই, ফুঃ।

রাত্তিরে ঘুম এলো না সুনীলের। খোলা চোখের পাতা দু'টোর মত সারা রাত্তির তার মনও যেন চেয়ে রইল মল্লিকার দিকে।

৩

প্রোগ্রাম শেষ হতে আর অল্প দেরী। সবুজ-ঘরে আর কেউ নেই। মল্লিকা বেরিয়ে যাচ্ছিলো। রাস্তা আগলালো আশোক চন্দ। স্যুট পরলে অশোক চন্দকে চমৎকার মানায়। মল্লিকা তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। এ-হাসির অর্থ বুঝতে দেরী হয়নি তার। সারা জীবন সমস্ত মেয়েদের মুখের এই হাসি পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। তারপর আর নয়। দীর্ঘ ছফুট দেহ কুঞ্চিত কোরে আনলো। তার পর মুখটা নেমে এলো মল্লিকার মুখের ওপর। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুললো সে, মল্লিকার চোখ তখন বুজে এসেছে। আরও একটু এগুতো অশোক। কিন্তু না, ভুল হোলো। হাতটাকে আটকে দিতে দিতে মল্লিকা শুধু বল্লে ঃ "D'ont be silly"

ব্যস্, কী যে হয়ে গেলো অশোকের। ছেড়ে দিলো মল্লিকাকে। তার এত দিনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগলো না। এত দূর এগিয়েও ফিরতে হোল তাকে, আর সেই সঙ্গে বহু অপেক্ষিত, উদগ্র কামনার উত্তপ্ত, সেই দীর্ঘ একটি চুম্বনও যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো।

প্রোগ্রামের পর গাড়ী কোরে বেরুলো মল্লিকা, অশোক, সুনীল—একসঙ্গে। অশোককে চাঙ্গা কোরে তুলতে মল্লিকা অনেক বার হাসলো। অশোকের মনে হোল যেন চাবুক!

স্বর্ণকান্তির শুধু সময় নেই। মল্লিকা চলে যাবে শিগ্গীর, ফিরবে না, অনেক দিন। পাতলা, লালচে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্বর্ণকান্তি ভাবলো আজ সে মল্লিকাকে বোলবে।

রাত্তির ন'টায় সময় হোল তার। ঘর ফাঁকা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সুনীল বেরিয়ে গেছে সেই সন্ধ্যেয়। ফ্ল্যাসের আড্ডা থেকে ফিরতে আজ-কাল অনেক রাত হয় তার। মল্লিকার চেয়ে খাঁটি-জিনের আমন্ত্রণই তার কাছে এখন লোভনীয়। অশোক গেছে রিচি-রোডের

চা-পার্টিতে। মল্লিকা যদি নাই মেলে, মিলিকেও তার জন্যে ফস্‌কাতে চায় না সে।

'মাসীমা', 'মাসীমা' বোলে ঘরে এসে ঢুকলো মল্লিকা। সুনীলের মা অবশ্য সাড়া দেন না। বোঝেন,—এ ডাক তার উদ্দেশ্যে নয়। স্বর্ণকান্তি চাঞ্চল হয়ে ওঠে। মল্লিকা বসে পড়ে গা-ঘেঁসে। কী কোরবে ভেবে পায় না স্বর্ণকান্তি। সমস্ত গুলিয়ে যায়। মল্লিকা, সময় দেয় আরো। না, আলোটাই বোধ হয় বাধা দিচ্ছে। উঠে পড়ে স্বর্ণকান্তি বল্‌লে : 'চলো, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দি মল্লি।

অন্ধকারে রাস্তায় হাতে চাপ দিয়ে স্বর্ণকান্তি জিজ্ঞেস কোরলে "আমাকে তোমার মনে থাকবে না—না ?"

অসহ্য। মল্লিকা আশা ছেড়ে দিলো। ন্যাকামী তার কাছে ন্যক্কারজনক। তবু আজ, আজ মল্লিকাও ন্যাকামী কোরবার লোভ সামলাতে পারলো না। বাড়ীতে ঢুকে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকা শুধু জবাব দিলো : "মনে রাখবার মতো কী-ই বা হোল আর ?—

৪

সবুজ-সঙ্ঘের ভিত্তিতেই ফাটল ধরলো ; স্বর্ণকান্তি আর আসে না। সুনীল দায়ী কোরেছে তাকেই। স্বর্ণকান্তিকে তার বিশ্বাস কোরে বলাই ভুল হয়েছিলো। সোজা প্রশ্ন কোরেছে সে, মল্লিকাকে, 'তুমি স্বর্ণকেও....বাকীটুকু লজ্জায় শেষ কোরতে পারেনি সে। শুনে মল্লিকা হেসেছে। ভীরু ছেলেটা সেদিন ফিরে যাবার পর বুঝি এই গল্প করেছে। কিন্তু স্বর্ণকান্তিকে ত সে বাধা দিতো না। বোকা—মল্লিকার সমস্ত স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে।

আসলে হিসেবে ভুল হয়েছিলো গোড়াতেই স্বর্ণকান্তি আর সুনীল দু'জনেরই। ওরা কিছুই গোপন রাখেনি। কিন্তু অশোক চন্দ জানতো মেয়েদের ব্যাপারে বন্ধু নেই কেউ। শেষ পর্য্যন্ত প্যাঁচ লড়েছে সেই। নিজের প্যাঁচে কিন্তু নিজেই পড়ে গেছে নিজেই।—নিজের জালেই জড়িয়ে গিয়ে, আটকে গেলো সে

*   *   *

মল্লিকা পালিয়ে এসেছে পুরীতে। বাবাকে নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আছেন শ্রীপদ; পাহারা হিসেবে। সুনীলদের বাড়ীতে যাওয়া, পুরীতে আসার আগেই বন্ধ হয়েছে তার। মনে মনে অবশ্য ঠিক কোরে নিতে দেরী হয়নি বেশী। এখান থেকে ফিরে যাবার আগেই, চিঠিতে পাকা কথা দিতে হবে কল্যাণ মিত্তিরকে। আগামী ফাল্গুনেই বিয়ের দিন চাইছে সে! আর তাছাড়া এরই মধ্যে কাণে আসতে আরম্ভ করেছে হালদারের ফর্সা-মেয়েটাকে কল্যাণের মরিস গাড়ীতে দেখা গেছে কয়েক বার। না,—কল্যাণকেই চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে এবার।

কিন্তু, এ-কি হোল?—মল্লিকা বার বার ভাববার চেষ্টা কোরল, অন্ধকারে সমুদ্রের শ্রান্তিহীন গর্জ্জন আসছে কাণে। রাত্তির অনেক হোল। কার পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরালো মল্লিকা। শ্রীপদ এতক্ষণে ফিরল। এই দিকেই তার ঘর। কিন্তু গেলো না সে। কাছে এগিয়ে এসে চেপে ধরল মল্লিকার হাত। কিন্তু মল্লিকার বুক ধ্বক করে উঠল কেন। এক চোখে শ্রীপদ হাসছে। মল্লিকার মনে কি এই ছিলো না-কী? না—এ ত নয়। কিন্তু শ্রীপদ স্বর্ণকান্তি নয়। সময় সে দিলো না।

সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরল মল্লিকাকে। নিশ্বাস নেবার জন্যে ঠোঁটটা ছাড়িয়ে নিতেই অন্ধকারে মল্লিকার মনে হোল শ্রীপদ যদি স্বর্ণকান্তির মুখটা নিয়ে আসত শুধু।

বাইরের আকাশে পূর্ণিমার গোল-চাঁদ পৃথিবী-প্রসবিনী সমুদ্রকে তখন প্রবল ভাবে টানছে।